www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

তাক্বলীদের
গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাসউদ আহমদ

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

তাক্বলীদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মূল
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাসউদ আহমদ

ভাষান্তর
মাওলানা হারুন ইযহার

সম্পাদনা
আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রকাশক
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সন্‌জরী পাবলিকেশন
৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫
৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَآئِمًا أَبَدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ
وَ الآلِ وَالصَّحْبِ ثُمَّ التَّابِعِيْنَ لَهُمْ
أَهْلُ التُّقٰى وَالنُّقٰى وَالْحِلْمِ وَالْكَرَمِ

﴿صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلَّمْ﴾

তাক্বলীদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
মূল : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাসউদ আহমদ
সম্পাদনা : আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী
ভাষান্তর : মাওলানা হারুন ইযহার

প্রকাশক : মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সন্‌জরী পাবলিকেশন : ৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫
সন্‌জরী পাবলিকেশন, ৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট (২য় তলা), আন্দরকিলা, চট্টগ্রাম
ফোন : ০৩১-২৮৫৮৫০৮, মোবাইল : ০১৬১৩-১৬০১১১, ০১৯২৫-১৩২০৩১

© সন্‌জরী পাবলিকেশনের পক্ষে নুরে জান্নাত তৃষা

প্রথম প্রকাশ : ১৫ এপ্রিল ২০১১ ইং, ১০ জমাঃ আওয়াল ১৪৩২ হিজরি, ২ বৈশাখ ১৪১৮ বাংলা

মূল্য : ১০০ [একশত] টাকা মাত্র

Taqlider Guruto O Proyoujoniota, By: Pro. Dr. Masud Ahmad Translated By: Harun Ezhar. Edited By: Abu Ahmad Jameul Akhtar Chowdhury. Published By: Mohammad Abu Tayub Chowdhury. Price: Tk: 100/-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সূচীক্রম

ভূমিকা/১
তাক্বলীদ - স্বাভাবিকভাবে যা অপরিহার্য/৬
কুরআন ও হাদিসের গুরুত্ব/৯
কুরআনের আলোতে প্রজ্ঞা/১৮
কুরআন ও হাদিসের আলোকে তাক্বলীদ/২১
ইমাম আবূ হানীফা : অবদান ও জীবন বৃত্তান্ত/২৬
আবূ হানীফার শিষ্যবৃন্দ/৪৩
যে সকল শিষ্যগণ হানাফী ফিকাহ লিখেছেন/৪৩
ইমাম আবূ হানীফা কুরআন-হাদীসের আলোকে/৪৪
পূর্ব ও পরবর্তী মনীষীগণের দৃষ্টিতে ইমাম আবূ হানীফা/৪৯
মুসলিম বিশ্বে হানাফী মাযহাবের জনপ্রিয়তা/৫৫
ইতিহাসের আয়নায় গায়রে মুকাল্লিদ/৫৯
আন্তর্জাতিক চক্রান্ত এবং সময়ের দাবি/৬৯
প্রমাণপঞ্জি/৭৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রকাশকের বক্তব্য

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাসউদ আহমদ ইসলামী জ্ঞানরাজ্যে এক পরিচিত নাম। তিনি ১৯৩০ সালে ভারতের দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় পাকিস্তানে হিজরত করেন। করাচিতে স্থায়ী বসবাস করতে থাকেন। তাঁর সম্মানিত পিতা মুফতি আল্লামা শাহ মুহাম্মদ মাযহারুল্লাহ দেহলভী ছিলেন যুগের প্রখ্যাত আলেম ও মুফতি এবং দিল্লী ফতেহপুর জামে মসজিদের খতিব ও ইমাম ছিলেন। প্রফেসর ড. মাসউদ আহমদ কর্মজীবনে পাকিস্তানের টাণ্ডটা সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং কিছুকাল সিন্ধু প্রদেশের শিক্ষা সচিবপদেও কাজ করেন। তাছাড়া তিনি পাকিস্তানের বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকও ছিলেন। নকশবন্দী-মুজাদ্দেদীয়া তরীকায় তিনি তাঁর পিতা থেকে খেলাফত অর্জন করেন। তরীকতের একজন শায়খ হিসেবেও তিনি তাসাউফ চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। বিশেষত চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাহমতুল্লাহি আলাইহির জীবন-কর্মের উপর ব্যাপক গবেষণার জন্য বিশ্বব্যাপী তিনি 'বিশিষ্ট আ'লা হযরত গবেষক' (رضويات) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

ড. মাসউদ আহমদ ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আজীবন লেখালিখি চালিয়ে যান। তাঁর গবেষণা পুস্তকগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। বর্তমান বিশ্বে এক শ্রেণীর কিছু লোক ইসলাম ও মুসলমানের স্বীকৃত মাযহাব চতুষ্টয়ের যেকোন একটির অনুসরণ না করে নিজ নিজ খেয়াল-খুশী মত কুরআন-হাদিসের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। ফলে মুসলমানদের মধ্যে নানা দ্বন্দ্ব দেখা দিতে শুরু করেছে। আলোচ্য পুস্তকে লেখক মাযহাব অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সারগর্ভ আলোচনা করেছেন। বিশেষত কতিপয় গায়রে-মুকাল্লিদ কর্তৃক ইমাম আযম আবূ হানীফার প্রতি অপবাদের খণ্ডনও করা হয়। পুস্তকটি পাঠে তাক্বলীদ তথা মাযহাব অনুসরণ নিয়ে আমাদের বিভ্রান্তি দূর হবে- এ আশায় আমরা এ গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকটি অনুবাদের উদ্যোগ নিই।

অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা মূল আবেদন রক্ষা করার চেষ্টা করেছি। তবে এ বিষয়ে বিচারের ভার পাঠকের হাতে। ভুল-ত্রুটি অবহিত করলে আগামী সংস্করণে সংশোধনের প্রতিশ্রুতি রইল।

সালামসহ
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

এই সময় মুসলিম উম্মাহ আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের আবদ্ধ। যে ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য হল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উম্মতের দুরত্ব সৃষ্টি করা এবং তার মহান মর্যাদার বিরুদ্ধে বেয়াদবি করা। প্রত্যেক ঐ বিষয় থেকে দুরত্ব সৃষ্টি করাও উদ্দেশ্য যেগুলোর সাথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পর্ক রয়েছে এবং যারা মহানবীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সংরক্ষক। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে মহানবী থেকে দূরে চলে গেছে সে স্বয়ং আল্লাহ থেকে দূরে চলে গেছে। যার অন্তরে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নেই তার অন্তরে আল্লাহর প্রতিও কোন মর্যাদাবোধ নেই। নেই বাইতুল্লাহর সম্মানও। এটি কাল্পনিক কথা নয়, হেরেম শরীফে উপস্থিত হয়ে যে কোনো আগন্তুক এই বাস্তবতাকে স্বচক্ষে অবলোকন করতে পারবে। যেন আসল উদ্দেশ্য ইসলামের সাথে দূরত্ব সৃষ্টি করা। ইসলাম তো কতিপয় আচার-অনুষ্ঠানের নাম নয়। এটা তো আত্মোৎসর্গ ও নিজেকে বিলিন করে দেওয়ার নাম। সারা দুনিয়া এই আবেগকে ছিনে নেওয়ার জন্য আগ্রাসন চলাচ্ছে।

এই প্রয়াস নেওয়া হয়েছে যে, কোনো না কোনোভাবে মুসলিম মিল্লাত মহানবীর দামন থেকে দূরে সরে পড়ুক। আর এই উদ্দেশ্য সাধনে ইসলামের শত্রুরা এই পরিকল্পনা নিয়েছে যে, তাঁর কথায় যেন সন্দেহ সৃষ্টি করা হয়, যারা তাঁর দামন সংশ্লিষ্ট এবং যারা তার প্রজ্ঞার প্রতিনিধি এমন সব বুযর্গদের ব্যাপারে যেন অন্তরকে খারাপ করা হয়। এভাবে মুসলমানদের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করা হয়। তারপর যে শত্রু ইচ্ছা করে তাদেরকে নিজের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে। এই প্রক্রিয়া দুই শতাব্দি থেকে জোরালোভাবে চলে আসছে। অতীতের ইতিহাস এই মতকে সমর্থন করে।

মুখবন্ধ লেখার সময় হঠাৎ ডাক থেকে একটি চিঠি পেলাম যেখানে লিফলেটের কিছু কাগজ ছিল। যেখানে কোন লেখকের নাম নেই এবং নেই কোন প্রেরকের নাম ও ঠিকানা। সেই লিফলেটগুলো থেকে ঐ সব দূরভি সন্ধির কথা অনুমান করা যেতে পারে। ঐ প্রচার পত্রগুলোতে রাসূলের সুন্নাত হাদীস শরীফ এবং হাযরে আসওয়াদ সম্পর্কে খারাপ ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এবং শব্দের গোপনীয়তার ভিতর দিয়ে আকাবেরীন এবং সলফে সালেহীনদের ব্যাপারে বিরূপ মনোভাবি করে তোলার চেষ্টা করা হয়। (ইন্না লিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহে রাজেউন)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বড়দের সম্মান ছোটদেরকে স্নেহ মুসলিম উম্মাহর বৈশিষ্ট্য হিসেবে চলে আসছে। এই সম্মান প্রদর্শন মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের শক্তিশালী বন্ধনস্বরূপ ছিল। সেটাকে অব্যাহতভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে এবং সলফে সালেহীনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হচ্ছে। আল্লামা ইকবাল মুসলিম নওজোয়ানদের মূল ব্যাধি নির্ণয় করে বলেছিলেন, সালফের বুযর্গদের ব্যাপারে মন্দ ধারণা তাদের সবচেয়ে বড় রোগ। বিশ্বাসে জাতির বিকাশ ঘটে। বিশ্বাস নড়বড় হলে জাতি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। অন্যায় কোন চিকিৎসক নয়; বরং সেইটা ব্যাধিকে আরো বাড়িয়ে দেয় এবং সেই অন্যায় নিজের পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞ। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বড়দের ব্যাপারে আদব রক্ষা করার তৌফিক দান করুন। আমীন

নিবন্ধকারকে কিছু হিতকাঙ্খী বলেছিলেন, কিছু লোক দ্বীন প্রচারের বাহনায় শহর ও গ্রামের সাধাসিধে মুসলমানদেরকে বুযর্গদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা দিয়ে যাচ্ছে। এমন কি সাহাবায়ে কেরাম, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, তাবেয়ীন, তবয়ে তাবেয়ীন, আহলুল্লাহ এবং হকপন্থি ওলামাদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা প্রচার করে চলছে। স্বজ্ঞানে কোনো মুসলমান এমনটা করতে পারেনা। একমাত্র সেই করতে পারে যার হাকিকত সম্পর্কে জ্ঞান নেই, অথবা যেই ব্যক্তি অন্যের হয়ে কাজ করে যাচ্ছে। আল্লাহু আকবর! কাদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা দেওয়া হচ্ছে! যারা কুরআন-হাদীসকে নিজের বক্ষে ধারণ করে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন। যাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কোটি মানুষ রাস্তার সন্ধান পেয়েছে এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে শাসন করে গিয়েছে। যাদের থেকে আমরা পিঠ পিরিয়ে নিলে আমাদের আর কোন কিছু অবশিষ্ট থাকেনা। সব কিছুই তো তাদের দেওয়া। আফসোস! আমরা জেনে শুনে অজ্ঞতার দিকে পা অগ্রসর করছি। কি করছি আমরা? আমাদের মুর্খতা আমাদের জ্ঞানের উপর জেঁকে বসেছে। আমাদের জীবন মৃত্যুতে রূপান্তর হতে চলছে।

কি হচ্ছে এই সব! কেন বা হচ্ছে এই সব! একটু কি চিন্তা করার দরকার নেই।

অধ্যয়নে জানা যায় যে, আমাদের খাদ্যে ভেজাল রয়েছে, আমাদের ইতিহাসে ভেজাল রয়েছে, আমাদের রাজনীতিতে ভেজাল রয়েছে, আমাদের তরীকায় রয়েছে ভেজাল। মোটকথা যেই দিকে লক্ষ্য করুন সেই দিকে ভেজাল আর ভেজাল। সেই ভেজাল থেকে আসল জিনিসটাকে বের করে আনা দুধের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

স্বর নিয়ে আসার চেয়ে কম নয়। খাদ্যের ভেজাল আমাদের শরীরকে অসুস্থ করে দিয়েছে। শিক্ষার মধ্যে ভেজাল আমাদের মানসিকতাকে রোগাক্রান্ত করে দিয়েছে। রাজনীতির মধ্যে ভেজাল আমাদের সরকারগুলোকে অসুস্থ করে দিয়েছে। তরীকতের মধ্যে ভেজাল আমাদের আধ্যাত্মিক ভাবকে ব্যাধিগ্রস্থ করে দিয়েছে। আল্লাহ রহম করুন আমাদের উপর। সত্যবাদি হওয়া এবং সত্যবাদিদের সাথে থাকার তৌফিক দান করুন। আমীন॥

উম্মাহর তরুণদেরকে সত্যকথা বাতলানো উচিত। মিথ্যার ব্যাপারে তারা এখন অকৌতুহলি হয়ে পড়ছে। সত্যের সন্ধানে তারা এখন পাগল পারা। একটু চিন্তা করুন, আইয়িম্মায়ে মুজতাহিদীন ইমাম আবূ হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এর ব্যাপারে এই অনুভূতি দেওয়া হচ্ছে যে, যেন এরা অনেক শতাব্দীকাল পরের ব্যক্তিত্ব, কিন্তু অনেকে এটাও জানেনা যে, আইয়িম্মায়ে মুজতাহিদীন এবং মুহাদ্দিসগণ প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর লোক। যার মানে তাঁরা খায়রুল কুরুনের লোক। যে যুগকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বোত্তম যুগ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যখন এ বাস্তব সত্যটি মানুষ জানতে পারে তখন তারা অবাক হয়ে যায় এবং অন্ধকার থেকে আলোতে বেরিয়ে আসে এবং নিজের চিন্তাধারাকে সঠিক করে নেয়। কৃতিবানদের অবদান স্বীকার করে নেয়। আর এটাই হওয়া চাই প্রত্যেক বিবেকবানের কাজ।

মুজতাহিদ ঈমামগণকে জড়িয়ে বিভিন্ন রকম ভুল কথা রটানো হয়েছে। একটি কথা প্রচার করা হয় যে, এসব ব্যক্তি স্বীয় কল্পনা ও চিন্তধারার একটি সমষ্টি তৈরি করে তার নাম রেখে দিয়েছে ফিকাহ্ এবং (নাউযুবিল্লাহ) তার সাথে নাকি কুরআন এবং হাদীসের কোন সর্ম্পক নেই। দ্বিতীয় যে কথাটি প্রচার করা হয় তা হল, হাদীস শরীফের কোন লিখিত পুঁজি নেই। কয়েক শতাব্দী পর শুনে শুনে তা সম্পাদনা করা হয়েছে। এজন্য বেশী গ্রহণযোগ্য নয় (আল্লাহর পানাহ)। ইতিহাসের আলোকে এসব কথাগুলো বাজে ও ভিত্তিহীন। যা বইটি অধ্যয়ন করলে বুঝা যাবে।

বিবেদের এবং সমালোচনার স্তুপের চাপা পড়ে আছে তরুণরা। তারা নানা অংশে বিভক্ত হয়ে যার-তার সম্মুখীন হচ্ছে। একেক জনকে জিজ্ঞেস করছে যে, দু'জাহানের মুকুটধারী মহানবীর পদাঙ্ক অনুসারণকারীরা কোথায় গেল? কেউ তাদের উত্তর দিচ্ছেনা। অতঃপর সে নিজের মত করে পথচলা শুরু করে দিয়েছে। আমরা শত্রুদেরকে খুশী করার জন্য বিভক্ত হয়ে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পড়েছিলাম। এখন আপনদেরকে খুশী করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। ঐক্যের মধ্যে অনেক বরকত রয়েছে। ঐক্যের মধ্যে বড়ই শক্তি রয়েছে।

কোন দল অথবা জামাতের বিরুদ্ধে নিবন্ধকারের কিছু লেখার অভ্যাস নেই। কিন্তু যখন দেখতে পাই যে, যা নয় সেটা দেখানো হচ্ছে এবং যা বাস্তবে রয়েছে তা লুকানো হচ্ছে, তখন লেখাটা নিজের জন্য ফরজ জ্ঞান করি। যেন যেটা বাস্তব সেটা দেখা যায় এবং যা অবাস্তব সেটা যেন আত্মগোপন করে এবং অধ্যয়নকারী হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যের ব্যপারে যোগ্যবান হয়ে উঠে।

এই চেতনার ভিত্তিতে নিবন্ধকার 'তাকলীদ' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছি। প্রবন্ধ কিছুটা দীর্ঘ ছিল। এই জন্য ১৯৯৬ সালে প্রথমে ১৬ পৃষ্ঠায় তা সংক্ষিপ্তাকারে তৈরী করা হয়। যা তাক্বলীদের শিরোনামে এদারায়ে মাসউদিয়া করাচি একই বছর প্রচার করে। সংক্ষিপ্ত এই পুস্তিকাটি ইংরেজীতে দুইটি অনুবাদ করা হয়। যা সেই বছরেই এদারায়ে মাসউদিয়া প্রকাশ করে। এখন মাওলানা জাকেরুল্লাহ মুজাদ্দেদী আফগানী তার আরবী তরজুমা করেছেন। যা ছাপার অপেক্ষায় রয়েছে। বক্ষমান নিবন্ধ তাড়াহুড়া করে লিখা হয়েছে। কেননা নিবন্ধকার অনেক ব্যস্ত। এই প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি তৈরী করেছেন স্নেহভাজন সৈয়দ মুহাম্মদ মাজহার কাইয়ুম। পাঠকদের কোথাও কোনো ভুল প্রলক্ষিত হলে তা জানিয়ে বাধিত করবেন। যেন দ্বিতীয়বার প্রকাশের সময় আরো সঠিক পূর্ণাঙ্গরূপ দেওয়া যেতে পারে।

এই নিবন্ধটিকে ৯টি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে তাক্বলীদের উপরে সাধারণ আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে হাদীসের ঐতিহাসিক গুরুত্বের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে আইয়িম্মায়ে মুজতাহিদীন ইমাম আবূ হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং মুহাদ্দিসগণের গুরুত্বের কথা উল্লেখ রয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে ইমাম আবূ হানিফার ব্যক্তিত্ব এবং তার ইলমী অবদানের উপর আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে কুরআন-হাদীস এবং মুতাকাদ্দেমিন ও মুতাআখিরীনগণের মতামতের আলোকে ইমাম আবূ হানিফার মহত্বের উপর পর্যালোচনা করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে মুকাল্লিদ্দের আলোচনা এবং অষ্টম অধ্যায়ে গায়রে মুকাল্লিদের আলোচনা করা হয়েছে। নবম অধ্যায়ে বিশ্ব মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইসলামের শত্রুদের ষড়যন্ত্রের বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নিবন্ধটি রচনা ও সম্পাদনায় নিম্মোক্ত উলামায়ে কেরামগণ সহায়তা করেছেন। নিবন্ধকার আন্তরিকভাবে তাঁদের কৃতজ্ঞ। আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল হাকীম শরফ কাদেরী, শায়খুল হাদীস জামেয়া নিজামীয়া লাহুর, শায়খুল হাদীস আল্লামা কাজী মুহাম্মদ আহমদ মুজাদ্দেদী নাঈমী করাচী, আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ জান মুজাদ্দেদী নায়েমী, শায়খুল হাদীস ও মুহতামিম দারুল উলুম মুজাদ্দেদীয়া নাঈমীয়া করাচী, আল্লামা মনজুর আহমদ সাঈদী করাচী, প্রফেসর ড. হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল বারী সিদ্দিকী করাচী, প্রফেসর ড. হাফেজ মুহাম্মদ রফিক মুজাদ্দেদী মাসুদী লাহোর, জনাব সৈয়দ আনোয়ার আলী, এডভোকেট সুপ্রিম কোর্ট অফ পাকিস্তান, জনাব মুহতারম মাসউদ আহমদ সাহেব জাহানদীর (ওহারী, মিলসি পাঞ্জাব), মাওলানা আতাউল্লাহ নকশবন্দী মুজাদ্দেদী প্রমুখ।

আলহামদুলিল্লাহ ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ, হিতাকাঙ্খীগণের সহযোগিতায় এ কিতাবটি পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। যা কিছু লেখা হয়েছে সৎ উদ্দেশ্যে চিন্তাধারা সংস্কারের জন্য লেখা হয়েছে। সত্য কথাগুলো প্রকাশ করার জন্য লেখা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সৎ রাস্তার উপর পরিচালিত করুন। ঐ সব প্রিয় বান্দাদের রাস্তার উপর যাঁদের উপর তিনি নেয়ামত বর্ষণ করেছেন এবং আমাদেরকে সত্যকে গ্রহণ করার এবং তার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন।

آمين بجاه سيد المرسلين رحمة للعالمين صلي الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وسلم

অধম মুহাম্মদ মাসউদ আহমদ
১৭/২ সি. পি. এ. সি. এইচ. সুসাইটি।
করাচী, ৭৫৪০০ ইসলামি প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান
জমাদিউস সানী ১৪২০ হি., ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৯ ইং, জুমাবার।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাক্বলীদ - স্বাভাবিকভাবে যা অপরিহার্য

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন[১] এবং তার স্বভাবের মধ্যে আল্লাহ্র প্রতি একটি তাড়নাও সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, 'নিজের মুখ সোজা কর আল্লাহ্র আনুগত্যের জন্য, একান্ত তার দিকে মনোযোগী হয়ে, আল্লাহ্রই গড়া প্রকৃতির বুনিয়াদ, যার উপর আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।"[২]

হ্যাঁ তিনি কোন্ দিকে? যে দিকেই মুখ ফিরায় সেদিকেই তো আল্লাহ্।[৩] কিভাবে পাবো? কোথায় অনুসন্ধান করবো? কেমন তরে পৌঁছবো উদ্দেশ্য পর্যন্ত? তিনি তো বড় দয়ালু কৃপাময়, তাঁকে আমরা কিভাবে ডাকবো, সে দোয়াও শিক্ষা দিয়েছেন আবার মনযিলের ঠিকানাও বাত্লে দিয়েছেন। 'আমাদেরকে সোজা পথে চালাও তাদের পথ যাদের উপর তুমি করুণা করেছ।'[৪] পদচিহ্ন ব্যতীত মনযিলের নাগাল পাওয়া দুস্কর। পথপ্রদর্শক চলতে লাগলেন আর পথিকরা তার পিঁছু যাত্রা করলেন। অতঃপর মনযিলে পদার্পন। এই পদচিহ্ন না হলে জানিনা আমরা কোথায় কোথায় ভটকে ফিরতাম। কত বড় অনুগ্রহ! পায়ের চিহ্ন দান করলেন, সোজা সড়কে চালিয়ে দিলেন, পৌঁছিয়ে দিলেন উদ্দেশ্য পর্যন্ত। জানিনা এই প্রক্রিয়া কবে থেকে তার সূচনা আর কত কাল তা চলতে থাকবে।

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে স্বভাবজাতভাবে মুকাল্লিদ বা অনুসরণকারী বানিয়েছেন। ব্যক্তিগত, আর্থ-সামাজিক, ভূগোলিক সর্বক্ষেত্রে তাকে দেখা যায় অনুকরণকারী হিসেবে। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির এক দল আরেক দলের এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের তাক্বলীদ বা অনুসরণ করেই চলছে। চেতনে অবচেতনে আমরা সকলে পরস্পর থেকে কিছু না কিছু শিখতে থাকি। সারা জীবন কত মানুষের না আমরা অনুসরণ করে থাকি। আর এতেই হয় যত প্রকার ভাঙ্গা-গড়া। আমাদের সকল প্রকার উন্নতি উৎকর্ষ এ অনুসরণেরই কাছে দায়বদ্ধ। বিজ্ঞানের উৎকর্ষসমূহে এই অনুসরণের ছাপ ফুটে উঠে। একজন আরেকজন থেকে শিখেছেন। তাক্বলীদ থেকে পালানোর সুযোগ নেই। মানুষের প্রত্যেক কথা ও কাজে তাক্বলীদ বা অনুসরণের ছাপ রয়েছে। তাক্বলীদ ব্যতীত নেই কোন উপায়।

---

১. আল-কুরআন, সূরা রূম, আয়াত : ৩০
২. আল-কুরআন, সূরা রূম, আয়াত : ৩০
৩. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ১১৫
৪. আল-কুরআন, সূরা ফাতিহা, আয়াত : ৬-৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১০ম হিজরী শতকে বাদশাহ আকবর কিছু দুগ্ধপোষ্য শিশুকে পৃথক একটি ঘরে রেখে দিয়েছেন এটা জানার জন্য যে, যারা অনুসরণের জন্য কোন মানুষের ছোয়া পাবেনা তারা যখন বুদ্ধিমান হবে তখন তারা বুলি কিভাবে শিখবেন? উঠা-বসা কেমনে করবেন? তারা যখন বুদ্ধির বয়সে উপনীত হলো তখন তারা জীব-জন্তুর ভাষা উচ্চারণ করছিল। মানুষের সৌন্দর্য তাদের মধ্যে দেখা দিলনা। কেননা তারা মানুষের পরিবেশ থেকে দূরে ছিল। অনুসরণ করতে পারেনি। অনুসরণ করলে বুলি, চলা-ফেরা এবং উঠা-বসা করতে পারতো। তাক্বলীদ বা অনুসরণ যেহেতু করতে পারেনি সেহেতু সকল গুণ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেল।

তাক্বলীদ একটি বাস্তবতা। অনেক বড় বাস্তবতা। তাকে এড়িয়ে যাওয়া যায়না। প্রতিটি ঘরে ঘরে রয়েছে মুক্বাল্লিদের বাস। যে শিশু এখনোও মাদ্‌রাসা এবং স্কুল দেখেনি সে শিশু মাতা-পিতা ও ভাই-বোনকে অনুসরণ করে। সবার থেকে চোখবুজে থাকলে তো সে কোন কাজের হবেনা। এজন্যই আমরা ছেলে-মেয়েদের জন্য উত্তম থেকে উত্তম শিক্ষক এবং উত্তম থেকে উত্তম স্কুল খুঁজে থাকি, যেন ভাল লোকের পরশে থেকে সেও ভাল হতে পারে। এমন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি নেই যে একথা বলবে, বই যেহেতু আছে ছেলে নিজেই পড়া-লেখা করে নিবে। বুঝের কথা হলো উত্তম শিক্ষককে স্বীয় পথপদর্শক হিসেবে গ্রহণ করা এবং নিজেই পড়া-লেখা করে নেয়ার অলিক কল্পনায় জীবনকে ব্যর্থ এবং ভবিষ্যতকে ধ্বংস করা হবেনা।

তাক্বলীদ জাতীয় উন্নয়নের অপরিহার্য অংশ। সভ্যতা-সংস্কৃতি তাক্বলীদকে বাহন করে এগিয়ে যায়। সমাজের উপর দৃষ্টি দিলে জীবনের প্রতিটি শাখায় তাক্বলীদের কৃতিত্ব নজরে পড়ে। কথোপকথনে অনুসরণ, পানাহারে অনুসরণ, পরিধানে অনুসরণ, বসবাসে অনুসরণ, চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুসরণ, কাফের-মুশরেক এবং ইহুদী-খৃষ্টানদের অনুসরণ। কারোও চিন্তায় আসেনি যে আমরা কেন অনুসরণ করছি। তাও আবার কাফের-মুশরেকদের অনুসরণ! তাক্বলীদ একটি জাতীয় ও সামাজিক প্রয়োজন এবং প্রকৃতির চাহিদা। তাক্বলীদ বা অনুসরণ ব্যতিরেকে আমরা এক কদমও অগ্রগামী হতে পারবোনা। এজন্য কুরআনে হাকিমে এই নির্দেশনা দেয়া হয়েছে- 'হে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ঈমানদারগণ! আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর চলো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।'[৫] সত্যবাদীদের অনুসরণ মানুষকে মানুষ বানায়।

তাক্বলীদ বা অনুসরণের কারণে মানুষ অনেক ব্যাঘাত থেকে রক্ষা পেয়ে যায় এবং যে ক্ষেত্রেই সত্যবাদীদের অনুসরণ করা হয় সে ক্ষেত্রটি ভালভাবে শোধরে যায়। বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। আমরা অনুধাবন করিনা। যদি একটু অনুধাবন করি, তাহলে বিষয়টি এমনিতে বোধগাম্য হয়। আমরা বর্ণমালার সাজানো গঠনকে শব্দ বলি, শব্দের সাজানো গঠনকে বাক্য বলি, বাক্যের সাজানো গঠনকে পঙক্তি বলি, পঙক্তির সাজানো গঠনকে প্রবন্ধ বলি আর প্রবন্ধের সাজানো গঠনকে বই বলি। আর বই পড়ে পড়ে জীবন গড়া হয়। কেউ বলেনা যে, আমরা বর্ণমালা দিয়ে নিজেরাই শব্দ তৈরী করবো, নিজেরা ভাষা তৈরী করবো, নিজেরা বলবো এবং অন্যদেরকে বলাবো। আমরা অন্য মানুষের তৈরী করা জিনিসের উপর বিশ্বাস রাখিনা। এ জাতিয় কথা-বার্তা কেউ বলে থাকলে তাহলে সেটা নিতান্তই অযৌক্তিক এবং অস্বাভাবিক। প্রকৃতির ধারাকে রুখা অসম্ভব। আমরা উত্তম থেকে উত্তম সমাজ ও জীবনের অনুসরণের চেষ্টা করি। তাহলে উত্তম থেকে উত্তম চিন্তাধারার অনুসরণ করবোনা কেন? যে বিষয়টি অন্যরা যাচাই করেছেন এবং গভীরভাবে চিন্তা করেছেন সেটাকে প্রত্যাখান করে নিজেরা যাচাই ও চিন্তা করার কথা কেন আসবে? অনুসরণ ব্যতীত আমরা নিজেদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণ করতে পারিনা। আবেগ তাড়িত না হয়ে শীতল মনে এ কথা চিন্তা করতে হবে। এক লোক তৈরী করা গৃহে থাকেনা, সে বলে ইট-পাথর যেহেতু আছে আমি নিজেই একটি গৃহ বানিয়ে নিব। এই লোককে কেউ বুদ্ধিমান বলতে পারেনা। বুদ্ধির কথা হলো যে জিনিস তৈরী হয়ে গেছে তাকে নিজে পুনরায় বানানোর আগ্রহে যেন নষ্ট না করা হয় এবং ইতিহাসের বিবর্তনের ধারাকে আঘাত না করা হয়। কুরআন শরীফে এ আদেশ দিয়ে ঐতিহাসিক ধারাকে চলমান রাখা হয়েছে।

> 'অতঃপর আমি তোমার কাছে ওহী পাঠিয়েছি এ কথার যে ইব্রাহিমের দ্বীনকে অনুসরণ করো যিনি প্রত্যেক বাতিল থেকে পৃথক ছিলেন এবং মুশরেক ছিলেন না।'[৬]

কুরআন শরীফে বারংবার আনুগত্য ও অনুকরণের উপর তাগিদ করা হয়েছে-[৭] এ ঐতিহাসিক ধারাকে জারি রাখার জন্য।

---

৫. আল-কুরআন, সূরা তাওবা, আয়াত : ১১৯
৬. আল-কুরআন, সূরা নাহল, আয়াত : ১২৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাস্তবতা হলো, তাক্বলীদ ছাড়া উপায় নাই। যে ব্যাক্তি তাক্বলীদ করতে চায় না সেও তাক্বলীদের জন্য বাধ্য। কারো না হোক অন্তত নিজের মৌলভীর হলেও। যেমনটা মাজহাব অস্বীকারকারী স্বীয় গড়া মাযহাবের উপর চলে। রাস্তা ব্যতীত চলা কঠিন। এজন্য যেসব ব্যক্তি তাক্বলীদ বিরোধী তারাও তাক্বলীদের উপর বাধ্য।

এটি একটি প্রাকৃতিক ও সামাজিক জরুরত। বিশিষ্ট আহলে হাদিস আলেম নওয়াব ওয়াহিদুজ্জামান (১৩৪৮ হি./১৯২৯ ইং) যথার্থই বলেছেন, 'আমাদের আহলে হাদিসের ভাইয়েরা ইবনে তাইমিয়া (৭২৮ হি./১৩২৮ ইং) ইবনে কাইয়্যিম (৭৫১ হি./১৩৫০ ইং) সাওকানী (১২৫০ হি./১৮৩৪ ইং) শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ (১১৭৬ হি./১৭৬২ ইং) এবং মৌলভী ইসমাঈল (১২৪৭ হি./১৮৩১ ইং) কে দ্বীনের ঠিকাদার মনে করে আছেন। কোন মুসলমান এ বুযর্গদের বিপরীত কোন মতামত গ্রহণ করলে তার পিছনে লেগে যান। তাকে ভাল-মন্দ বলেন। ভাইয়েরা! সামান্য চিন্তা করুন এবং ইনসাফ করুন যদি তোমরা আবূ হানিফা, শাফেঈ'র তাক্বলীদ ছেড়ে দাও তাহলে ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাইয়্যিম এবং সাওকানী যারা অনেক পরের তাদের তাক্বলীদের কি প্রয়োজন।'[৮]

নবাব ওয়াহিদুজ্জামান খানের কথা পুরো সত্য। তাক্বলীদ ব্যতীত কোন বাঁচার উপায় নাই। এটা মানুষের প্রকৃতিগত বাধ্যকতা এবং তার স্বভাবের দাবি। এসব কথাকে হাজার বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই এবং হাজারবার অস্বীকার করলেও সেটাকে অস্বীকার করা যায় না।

কুরআন ও হাদিসের গুরুত্ব

কুরআন শরীফ একটি কিতাব। কিন্তু সব কিতাবের মূল। তাতে সমস্ত জ্ঞানের বিষয়গুলো রয়েছে। এটি সকল কিতাবের স্পন্দন এবং সমস্ত জ্ঞানের প্রাণস্বরূপ। সেখানে সমস্ত ইল্‌ম রয়েছে।[৯] এতো জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক হৃদয়গ্রাহী জাগরণ, তার কাঠামোই ভিন্ন, তার প্রকৃতি অন্য রকম। কুরআনের পরিচিতিও হাদিসের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি আর তাই কুরআনকে চেনার জন্য হাদিস সম্পর্কে অবগতিও জরুরি। সেটা ব্যতীত কুরআনের ব্যাখ্যা অসম্ভব। হাদিসসমূহে রয়েছে বিশাল ভাণ্ডার। সে হাদিসগুলোকে ছেঁকে তার রত্ন বের

৭. আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত : ১২৫, ৫৯, সূরা ত্বহা, আয়াত : ৪৭, সূরা আরাফ, আয়াত : ১৫৭
৮. মুহাম্মদ হালিম চিশতী, হায়াতে ওয়াহিদুজ্জামান, পৃষ্ঠা : ১০২, করাচী
৯. আল-কুরআন, সূরা নাহল, আয়াত : ৮৯, সূরা আনআম, আয়াত : ৫৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করে আনা রত্নশীলকে মানায়। এই ভাণ্ডারকে ছাঁকা-ঝুকার কাজ তো তাদের যাদেরকে আল্লাহ্ চিন্তার সামর্থ্য এবং অন্তরের চক্ষু দান করেছেন। প্রত্যেক মণিমুক্তার জন্য এমন লোক দরকার যারা মণিমুক্তা চিনতে পারে। হ্যাঁ তারাই হলেন যাদেরকে বলা হয় 'ফক্বীহ্' ও 'মুজতাহিদ'। মুসলিম উম্মাহ্র উপর যাদের অবদান রয়েছে এরা হলেন তারা। কুরআন শরীফ স্ব-উদ্দ্যোগে বুঝতে পারাটা সম্ভব হলে তো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত বাহক এবং কর্মক ব্যক্তিত্বের দরকার ছিলনা। সুন্নাহ্ হলো কুরআনের কার্যকরী ব্যাখ্যা। এ জন্য সুন্নাহ্কে কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায়না। হাফেজ ইবনে কাইয়্যিমের ভাষায় (৭৫১ হি./১৩৫০ ইং) সুন্নাহ্ই হলো সেই 'হিক্বমত' যার উল্লেখ কুরআনে বরংবার হয়েছে।[১০]

স্ব-প্রণোদিত হয়ে হাদিসকে অনুধাবন করতে পারাটা যদি সম্ভব হতো তবে তার জন্য তো মুজতাহিদ ও ফক্বীহ্র প্রয়োজন ছিলনা। এসব যা কিছু হয়েছে সবি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া- যা আমাদের সামনে এসেছে এবং ইতিহাসে সংযুক্ত হয়ে গেছে। কুরআনের গভীরতা! আল্লাহু আকবার... হাদিসের রহস্য! সুবহানাল্লাহ্...। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বব্যাপী ভাষার অধিকারী ছিলেন।[১১] গ্লাসের মধ্যে একটি সমুদ্রকে আয়ত্ব করে নিতেন। আমাদের নজরে কি বা আসে? আমরা আর কি দেখতে পাই? কি আর বুঝি আমরা। আধুনিক গবেষণা থেকে জানা যায় মানুষ এখনো স্বীয় মস্তিস্কের ১০% শক্তিও ব্যবহার করেনি। অতঃপর কুরআন-হাদিস অনুধাবনের জন্য মেধা কোত্থেকে অর্জন করবে? ইংরেজী ভাষা আমাদের জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও কোন বিজ্ঞানীর বই বুঝে উঠতে পারিনা। এ হলো আমাদের অনুধাবন শক্তির যে বেহাল দশা। আর কুরআন তো কুরআনই যার নিখুঁত রহস্য বিদ্যমান রয়েছে ভাজে ভাজে। পর্দা অপসৃত করতে থাকো দেখতে পাবে নতুন নতুন আলোক রাশি।

কুরআনে হাকিম شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُوْرِ[১২] অর্থাৎ অন্তরগুলোর ব্যাধির উপশম। চিকিৎসক ছাড়া কে আছে যে ঐ হিক্মতের কিতাব থেকে উপকৃত হতে পারে এবং রোগীদের চিকিৎসা দিতে পারে। হাজারো প্রকারের তরুলতা রয়েছে, সেগুলোর গুণ আবিস্কার করা, উপদানগুলোকে পৃথক পৃথকভাবে

১০. ইবনে কাইয়্যিম : কিতাবুর রূহ, পৃষ্ঠা : ৯২
১১. আল বয়ান ওয়াত তবয়িন, ৪/২৯
১২. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস, আয়াত : ৫৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

চিহ্নিত করা, সেগুলোকে মিশ্রিত রূপ দান করা, রোগ নিরূপণ করা, অসুস্থদের জন্য ঔষুধ নির্বাচন করা- এ সবি বিশেষজ্ঞ এবং ডাক্তার ও হাকিমের কাজ। যে চিকিৎসক নয় এবং ডাক্তার ও হাকিম নয় কিন্তু তরুলতার বৈশিষ্টাবলী আবিস্কারের জন্য এবং যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করার জন্য বেড়িয়ে পড়বে তাকে একজন বুদ্ধিমান মানুষ বলা যায়না। আল্লাহ্ পাক প্রত্যেক বিষয়ের জন্য কাজের লোক তৈরী করেছেন। তাঁর কারখানায় কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারেনা। কুরআন-হাদিস তো চিরসজীব এক পুষ্পকানন। ফুলওয়ালা পুষ্পদানি বানায় এবং সাজ-সজ্জাকারী তা দিয়ে নিজের প্রাসাদকে সাজিয়ে তোলে। কোন এমন বুদ্ধিমান ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয়না যে ফুলগুচ্ছগুলোকে ফেঁকে মারে এবং ফুলওয়ালার পরিশ্রমকে মাটিতে মিশিয়ে দিবে।

কুরআন শরীফের অক্ষরগুলোর উপর কোন নুক্তা ছিলনা। ছিলনা কোন যবর, যের, পেশ। এটি কেবল সূরা এবং মনযিল বিশিষ্ট ছিল। পরবর্তীতে যখন ইসলাম অনারব অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লো তখন পর্যায়ক্রমে নুক্তা লাগানো এবং যবর, যের, পেশ লাগানোর কাজটি করা হয়। ত্রিশটি পারায় কুরআনকে বিভক্ত করা হয়, আবার পারাগুলোর মধ্যে রুকু, রুবু', নিসফ এবং সুলুস ইত্যাদি তৈরী করা হয়।[১৩] কুরআন প্রচারের এটি একটি স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা ছিল, যা জারী ছিল। আমরা সেটা রদ্দ করতে পারবোনা। আমরা একথা বলতে পারবোনা যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়কালে তো এমনটা ছিলনা। আমরা ভালোর চেয়ে ভালোটা অনুসন্ধান করতে থাকি। আল্লাহ্ তা'আলা তার রক্ষণার দায়ভার গ্রহণ করেছেন।[১৪] আল্লাহু আকবার! তার জাহের এবং বাতেন সবটাই সংরক্ষিত রয়ে গেল। এটি এক মহান মু'জিযা। দুনিয়ার কোন বই এইভাবে সংরক্ষিত নেই। কুরআন মুখস্ত স্মরণ রাখতে পারাও মু'জিযা। ওহী অবতীর্ণ হয়ে পড়লো আর এদিকে মুখস্ত হয়ে গেল আল্লাহু আকবার! এরপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়ে শুনিয়েছেন আর সাহাবায়ে কেরাম আত্মস্ত করে নিলেন। আল্লাহু আকবার! আত্মস্ত করার এই ধারাবাহিকতা চৌদ্দশ বছর পরেও বিদ্যমান রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। কোন বই মুখস্ত হয়না কিন্তু কুরআন মুখস্ত হয়ে যায়।

শুধু এটা নয় কুরআন ছাড়াও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখ থেকে যে কথাই বের হয়েছে সেটাই সংরক্ষিত হয়ে গেছে। হাদিস

[১৩]. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন লেখকের কিতাব, 'আখেরী পায়গাম' (করাচী থেকে প্রকাশিত, ১৯৯৮ ইং)
[১৪]. আল-কুরআন, সূরা হিজর, আয়াত : ৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শরীফসমূহ হয়ে গেল সংরক্ষিত। এ যে একটা কথা প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে হাদিসের সংকলন হয়েছে দুই আড়াইশ বছর পর- এটা ঠিক নয়। স্বয়ং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়তের বিধানসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়েছেন।[১৫] আমর ইবনে হাজমকে এ ধরনের দস্তাবেজ দশম হিজরীতে দান করা হয়েছে।[১৬] আরেকটি দপ্তর 'কিতাব আল সদ্কা' নামে লেখানো হয়েছিলো যাকে অবলম্বন করেছিলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু (১৩হি./৬৩৪ইং) এবং হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু (২৩ হি./৬৪৩-৪ ইং)। ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ্ (প্যারিস) একটি বই প্রকাশ করেছেন। যার নাম 'আল ওয়াসায়েক আল সিয়াসিয়্যাহ্ ফিল আহ্দিন নববী ওয়াল খিলাফাতির রাশেদাহ্'। এটি মিশর থেকে ছেপেছে। সেখানে শুধু নবী আমলের দুইশ'র বেশী দস্তাবেজ রয়েছে। পরবর্তী মুদ্রণে আরো চল্লিশটি চুক্তির প্রামান্য দস্তাবেজ সংযোজন করা হয়।

নবীর আমল থেকেই সাহাবাগণ ব্যক্তিগত উদ্দ্যোগে হাদিসসমূহের সংকলন শুরু করেছিলেন। ঐ প্রাণ প্রিয় নবীর প্রতিটি কাজের সংরক্ষণকারীরা তাঁর কথাকেও কি সংরক্ষণ না করে পারেন? চিন্তার বিষয় হলো যে, যাকে ভালবাসে সে তার সব কিছু হেফাজত করে, এটা মানুষের স্বভাব। আর ভালবাসা যত বড় মাপের হবে সংরক্ষণও হবে সমপরিমাণ ভাবগাম্ভীর্য ভরা। এটা কি করে হতে পারে সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক হাদিসগুলোকে সংরক্ষণ করবেনা, যুক্তি এটাকে মেনে নেয়না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও নির্দেশনাগুলো হেফাজত করা তত আশ্চর্যজনক নয় যতটা আশ্চর্যজনক হলো সেগুলোকে হেফাজত না করার বিষয়টি। হাদিসেও এ কথার সমর্থন রয়েছে। কুরআনের এই বাণী যে 'যা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে তা নিয়ে নাও আর যা তিনি নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো।'[১৭] এ থেকে এমনিতেই হাদিসের গুরুত্ব পরিস্কার হয়ে উঠে, কোন ব্যাখ্যার দরকার নেই। অনেক ছাত্র নিজের শিক্ষকের আলোচনাগুলো সংকলন করেন। পরে শিক্ষকের নামে তা প্রকাশ করা হয়। যখন ছাত্র শিক্ষকের কথাগুলো সংকলন করে আমরা তাকে ইতিহাসের একটি অংশ হিসেবে মেনে নিই। তাহলে চিন্তা করুন ঐ সব সাহাবা যারা দু'জাহানের

[১৫]. মুসনাদে দারমী, পৃষ্ঠা : ৬৭, জামিউল বয়ানে ওয়াল ইলম, ১/৭১
[১৬]. আল-ইস্তিয়াব, ১/৪৩৭
[১৭]. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন লেখকের কিতাব, 'আখেরী পায়গাম' (করাচী থেকে প্রকাশিত, ১৯৯৮ ইং)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সর্দারের জন্য স্বীয় ধন, সন্তান, প্রাণকে উৎসর্গ করেছেন তাঁরা আবার কি করে তাঁর কথাগুলো সংরক্ষণ করবেননা। সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে নবীযুগ থেকে হাদিস শরীফের মূলধনটি সাহাবাদের ব্যাক্তিগত সংকলন, ডায়েরী এবং স্মৃতির মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে সংরক্ষিত হয়ে আসছে। দুই তিনশ বছর পর সংকলনের কথা ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতার প্রমাণ। সমস্ত হাদিসগুলো লিখিত ও মৌখিকভাবে সংরক্ষিত ছিল। হয়ত আপনি আশ্চর্য করবেন স্মৃতির মাধ্যমে হাদিসকে কিভাবে হেফাজত করা সম্ভবপর ছিল। আমরা নিজেদের স্মৃতিশক্তি দিয়ে সাহাবাদের স্মৃতিশক্তি ওজন করে থাকি। তা মোটেও ঠিক নয়। শুধু একটি ঘটনা উপস্থাপন করবো যেটি দৃষ্টি খুলে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট।

মক্কার গভর্ণর মারওয়ান ইবনুল হাকাম (৬৫ হি./৬৮৪-৫ ইং) একদিন রাসূলের সাহাবা হযরত আবূ হুরায়রা (৫৭ হি./৬৭৬ ইং) কে ডেকে পাঠালেন এবং পর্দার আড়ালে একজন হস্তলিপিকারকে বসিয়ে দিলেন। মারওয়ান তাঁর কাছ থেকে হাদিস জিজ্ঞাস করতে লাগলেন। তিনি বলতে লাগলেন আর পর্দার পিছনে লেখক লিপিবদ্ধ করতে লাগলেন। অনেকগুলো হাদিস সংকলিত হয়ে গেল। এক বছর পর তাঁকে আবার দাওয়াত দিলেন একই হাদিস পুনরায় জিজ্ঞাস করলেন যেগুলো গত বছর তাঁকে জিজ্ঞাস করা হয়েছিল। পর্দার আড়ালে লিপিকার বসা ছিল যাতে সে তুলনা করে দেখে। আপনি এটা শুনে হতবম্ব হবেন যে, একটি অক্ষরও বেশকম হয়নি। গত বছর যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল সেটাই হুবহু প্রকাশ পেল। এ থেকে অনুধাবন করা যায় সাহাবায়ে কেরাম কুরআনের এই আয়াতের উপর কত গুরুত্ব সহকারে আমল করেছেন যে, 'রাসূল যা দান করবে তা নিয়ে নাও আর যা নিষেধ করবে তা থেকে বিরত থাকো।'[১৮]

এবার আমরা আরেকটু এগিয়ে যাই এটা দেখার জন্য যে, সাহাবায়ে কেরামগণ হাদিসের মহান মূলধনকে লেখার মাধ্যমে কিভাবে সংরক্ষণ করেছেন। সাহাবাগণ হাদিসের বিভিন্ন সংকলন তৈরী করেছেন। লিখিত হাদিসের ভাণ্ডার সমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত সহীফাসমূহ উল্লেখযোগ্য ঃ
সহীফায়ে সিদ্দিকী / সহীফায়ে আলভী / সহীফায়ে সুমরাহ্ /[১৯] সহীফায়ে সাদেকাহ্ / সহীফায়ে সহীহাহ্।[২০]

১৮. আল-কুরআন, সূরা হাশর, আয়াত : ৭
১৯. এ সহীফাটি হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতিক্রমে জমা করেছিলেন। (জামেউল বয়ান ওয়াল ইলম, ১/৭২)

সহীফায়ে ওমর (হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার কাছে হাদিসের বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে আমি সামান্যটুকু বের করেছি।)
সহীফায়ে আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর ইবনুল আ'স কুরশী (তিনি হুযূরের অনুমতিতে তাঁর বাণীগুলো লেখতেন।)[২১]

হযরত আনাসের পাণ্ডুলিপিসমূহ / সহীফায়ে উমর ইবনে হাজম / সহীফায়ে উরওয়াহ ইবনে জুবাইর।
সহীফায়ে সাআদ ইবনে উবাদাহ / আমর ইবনে উমাইয়্যাহ্ আল-দামরীকে হযরত আবূ হুরায়রা হাদিসের অনেকগুলো সংকলন দেখিয়েছেন।[২২]

এইতো গেল হাদিসের সংকলনের কথা। সাহাবাগণ শুধু হাদিস একত্রিত করেননি বরং তার ভাবার্থ আমাদেরকে বলে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্র পরে কুরআনের অর্থ ব্যাখ্যাকারী ছিলেন সাহাবাগণ। শুধু অর্থ নয় তাঁরা সিদ্ধান্ত দিয়ে গিয়েছেন।

সম্ভবত সর্বপ্রথম ইমাম মালেকের উস্তাদ ইবনে শিহাব যুহুরী উমর বিন আব্দুল আজিজের ইঙ্গিতে সূত্র বিবরণী সনদ্ সহকারে হাদিসকে সংকলিত করেছেন। মুসনদে আবূ হানিফা, কিতাবুল আ'ছার আবূ হানিফা, মুআত্তায়ে মালেক ইত্যাদি হলো সহীহ হাদিসসমূহের সংকলন। যেখানে ১৭শ হাদিস উল্লেখ রয়েছে। এরপর রয়েছে আরো কিছু ব্যক্তিগত সংকলন। যেমন-

- কিতাবুস সুনান- আব্দুল মালেক বিন আব্দুল আজিজ বিন জারিহ্ (১৫০ হি./৬৬৭ ইং)
- কিতাবুল ফারায়িজ- ইবনে মুকসাম (১৮৬ হি./ ৮০২ ইং)
- কিতাবুস সুনান- ইয়াহইয়া বিন জাকারিয়া (১৮৪ হি./ ৮০০ইং)
- কিতাবুস সুনান- ওয়াকি' ইবনুল জাররাহ্ (১৯৭ হি./ ৮১৬ইং)
- কিতাবুস সুনান- সাঈদ ইবনে আবি আরোবাহ্ (১৫৬ হি./ ৮৭২ইং)
- কিতাবুত তাফসীর- বশম বিন বশির (১৭৩ হি./ ৭৯৯ইং)

(ইমাম আবূ হানিফার শাগরেদ)

এসব মুহাদ্দিসগণ সিরাত, ইতিহাস, ফিক্বাহ্ , গদ্য ও পদ্যের উপরেও কিতাব লেখেছেন। এটি এক দীর্ঘ ইতিহাস।[২৩]

২০.
২১. জামেউল বয়ান ওয়াল ইলম, ১/৭২
২২. তাবকাতে হানাবেলা, পৃষ্ঠা : ৩২৫
২৩. তারিখে ইসলাম, আস সিয়াসী, ১/৩৯৬

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইতিহাস আমাদেরকে বলে সাহাবায়ে কেরামদের নিকট ব্যক্তিগত ভাবে হাদিসের কয়েকটি সংকলন সংরক্ষিত ছিল, যেমনটা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি প্রথম হিজরী শতকের কথা দ্বিতীয় হিজরী শতকে ইমাম আবূ হানিফা রাহমতুল্লাহি আলাইহি 'কিতাবুল আসার' নামে হাদিসসমূহের একটি সংকলন প্রস্তুত করেছিলেন। এরপর একই শতাব্দীতে ইমাম মালেক রাহমতুল্লাহি আলাইহি (১৭৯ হি./৭৯৫ ইং) মুআত্তা নামে হাদিসসমূহের একটি সংকলন তৈরী করেন তারও উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে। এরপর ইমাম বোখারী রাহমতুল্লাহি আলাইহি (২৫৬ হি./৮৭০ ইং), ইমাম মুসলিম রাহমতুল্লাহি আলাইহি (২৬১ হি./৮৭৪-৫ ইং), ইবনে মাজাহ্ (২৭৩ হি./৮৮৬-৭ ইং), ইমাম নাসায়ী (৩০৩ হি./৯১৫-৬ইং), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (২৯৪হি./৯০৭ইং), ইমাম তিরমিযী (২৭৯ হি./৮৯২ ইং) প্রমুখগণ হাদিসের সংকলন প্রস্তুত করেন।

মোটকথা হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনের ধারাবাহিকতা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে শুরু হয়ে যায় এবং দুইশতকের মধ্যে এ ধারাবাহিকতা পূর্ণঙ্গতা লাভ করে। ইবনে কাইয়্যিম এর ভাষায় হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে দুই ধরনের বাণী প্রচার করা হয়। নবুয়তের শাব্দিক বাণীর প্রচার এবং নবুয়তের ব্যাখ্যাগত ভাবার্থের প্রচার।[২৪] হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়তের বিধানগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন।[২৫] সাহাবী আমর বিন হাজম (১০ হি.) কে এ ধরনের একটি পাণ্ডুলিপি দান করা হয়।[২৬] এ পাণ্ডুলিপি চামড়ার উপর লেখা ছিল। ইমাম জুহুরীও সেটি দেখেছেন এবং চারো ইমামগণ মেনে নিয়েছেন। আরেকটি পাণ্ডুলিপি 'কিতাবুস সাদকা' লেখানো হয়েছিল, যার উপর হযরত আবূ বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু আমল করে থাকতেন। আবূ দাউদ, তিরমিযী এই পুতি থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।[২৭]

কুরআনের তাৎপর্য হলো, لَا رَيْبَ অর্থাৎ সন্দেহের কোন স্থান নেই। হাদিসের সংকলনগুলোর বৈশিষ্ট্য অনুরূপ যে সন্দেহ এবং বিশ্বাস দুটুকে আলাদা করে তুলে ধরা হয়েছে। এই সুন্দর বৈশিষ্ট্য দুনিয়ার কোন বইয়ের ব্যাপারে

[২৪]. জামেউল বয়ান ওয়াল ইলম, ১/৭২
[২৫]. মুসনদে আহমদ, পৃষ্ঠা : ৬৭, জামেউল বয়ান ওয়াল ইলম, ১/৭১
[২৬]. আল-ইস্তিয়াব, ২/৪৩৭
[২৭]. মুহাম্মদ আলী রচিত 'ইমামে আযম আওর ইলমে হাদিস' সিয়ালকুট, পৃষ্ঠা : ৯১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পরিলক্ষিত নয়। আমাদের অবস্থা তো এই যে, আমরা মিথ্যা বলা, মিথ্যা লেখা ও মিথ্যা শোনার উপর অব্যস্ত। এ জন্য হাদিস সবচেয়ে বড় গুণকে সবচেয়ে বড় ত্রুটি হিসেবে পেশ করে থাকি। যুক্তির কথা হলো যখন সন্দেহ এবং বিশ্বাসকে পৃথক করে দেয়া হয়েছে তখন বিশ্বাসকেই গ্রহণ করতে হবে, সন্দেহের ভিত্তির উপর বিশ্বাসকে বাদ দেয়া চলবেনা। এটাকে বোকামিই বলা হবে। আমরা পত্র-পত্রিকায় পড়ি, আমরা জানি মিথ্যাই হলো মূল উপাদান, তারপরও আমরা সেগুলোকে বাদ দিতে পারিনা, সেগুলো পড়া ছাড়া প্রশান্তি পাইনা। যে যুক্তি-প্রমাণ হাদিসের বেলায় আমরা প্রয়োগ করে থাকি পত্র-পত্রিকার বেলায় তার বিস্মৃতি ঘটে। এই ব্যাধি কি আমাদের অন্তরের? নাকি আমরা শত্রুর কুট-চালের শিকার? যারা প্রতারণা ও কৌশলের মাধ্যমে আমাদের সম্পদ আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চায়। হাদিস সম্পর্কে আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান গবেষক ড. হামিদুল্লাহ্‌র পর্যালোচনা লক্ষ্য করুন-

'এ বিষয়টি বড়ই আশ্চর্যের যে, অনেক অনেক শতাব্দীর দূরত্ব সত্ত্বেও এবং মধ্যখানে বর্ণনাকারিদের বংশের পর বংশ অতিক্রম হয়ে যাওয়ার পরও হাদিসগুলোর ভাবার্থ তো দূরের কথা একটি নুক্তা ও অক্ষরও পরিবর্তন হয়না এ মানবীয় সামর্থ্য এবং বিশ্বস্ততার সামনে এমনিতেই শ্রদ্ধার সাথে মাথা নুয়ে পড়ে।'[২৮]

সাহাবায়ে কেরাম সিদ্ধান্ত দেওয়ার পদ্ধতিটি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন। তাদের কাছ থেকে তাবেঈগণ এবং তাঁদের নিকট থেকে তাবয়ে তাবেঈনগণ। এই পদ্ধতি বংশ পরম্পরায় উলামা পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। এটি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যা চালু রয়েছে। ইবনে তাইমিয়া বলেন, রাসুলের সাহাবীগণের মধ্যে ১৩০ জনের চেয়েও বেশী 'নুফূসে কুদ্‌সিয়া' (পবিত্র আত্মার অধিকারী) ছিলেন।[২৯]

ইবনে হাজম (৫৪ হি./৬৭৩ ইং) লেখেন যে, ইবনে আব্বাস (৬৮ হি./৬৮৭ ইং) শুধু ফতওয়াগুলোকে বিশাল খন্ডসমূহে একত্রিত করেছিলেন যেটা তার ফেক্বহী সমুদ্রের একটি অঞ্জলি ছিল মাত্র।[৩০] এটি বিশ খন্ড ছিল।[৩১] শাহ ওয়ালিউল্লাহর মতে বেশি যারা ফতোয়া দিতেন তাঁরা হলেন এ চারজন। উমর, আলী, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আয়েশা, যায়েদ বিন ছাবেত, আব্দুল্লাহ

[২৮]. সহীফায়ে হুমাম ইবনে মুনাব্বিহ, পৃষ্ঠা : ৬৪
[২৯]. আ'লামুল মওকিয়ীন, পৃষ্ঠা : ৫
[৩০]. আল-ওয়াবিলুস সাইয়িব, পৃষ্ঠা : ৭৮
[৩১]. আল-আহকাম ফি উসুলল আহকাম

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইবনে উমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিলেন উমর, আলী, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস।[৩২]

চারো খলিফার ফেক্বহী এবং শরীয়াহ ফয়সালাসমূহ পৃথক পৃথক পুস্তকারে প্রকাশ হয়েছে। চার ইমামের প্রয়াসগুলোর উপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছে। ইসলামী সীমানার পরিধি বিস্তৃত হওয়ার সাথে সাথে প্রচারের গণ্ডিও বেড়ে যায়।

হযরত উমর লিখিত বিধি-বিধানের সাথে সাহাবাদেরকে বিজিত এলাকাতে পাঠাতেন। যেমন- আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (৩২ হি./৬৫২ ইং) কে একজন সাহাবীর সঙ্গে কুফায় পাঠিয়েছিলেন। যেটি ইমাম আবূ হানিফার (১৫০ হি./৭৬৭ ইং) আবাসভূমি ছিল। মা'ক্বল বিন ইয়াসার (৬০ হি./৬৭৯ ইং) আব্দুল্লাহ্ ইবনে মা'ক্বল (৮৮ হি./৭০৬ ইং) ইমরান বিন হুসাইন (৫২-৩ হি./৬৭২ ইং) কে বসরায় পাঠিয়েছেন। মুআবিয়া ও আবূ সুফিয়ানকে সিরিয়া পাঠিয়েছেন।[৩৩] অঞ্চলসমূহ বিজয়ের সাথে সাথে রকমারি সমস্যাও সৃষ্টি হয়েছিল। শুধু একদশকের মধ্যে কি পরিমাণ অঞ্চল বিজিত হয়েছে তা নিম্ন লক্ষ্য করুন:

- খালেদ বিন ওয়ালিদ (২১ হি./৬৩২ ইং) এবং আবূ ওবায়দা ইবনুল জাররাহ্ (১৮ হি./৬৩৯ ইং) ১৪ হি./ ৬৩৫ ইং সালে দামেস্ক (সিরিয়া) বিজয় করেন।
- সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (১৪ হি./৬৩৫ ইং) নভেম্বর ১৪৩৭ হি./৬৩৫ ইং সালে ইরানী সৈন্যদেরকে পরাজিত করে ইরান বিজয় করেন।
- ১৫ হি./৬৩৭ ইং সালে বেট্রিক বায়তুল মুকাদ্দাস হযরত উমরকে সমার্পন করেন।
- ১৬ হি./৬৩৭ ইং সালে ইরানীদের শাসনীয় রাজধানী মাদাইন বিজয় হয় ইরাকও আরবদের নিয়ন্ত্রনে চলে আসে।
- ১৭ হি./৬৩৮ ইং সালে কুফা এবং বসরার সামরিক চৌকিগুলো হযরত উমরের নির্দেশে বসানো হয়।
- ১৯-২০ হি./৬৪০-১ ইং সালে আমর ইবনুল আ'স (৪২ হি./৬৬৩ ইং) মিশর জয় করেন।
- ২২-২৫ হি./৬৪৩-৪৬ ইং সালের মধ্যে ইরানের বিজয় পরিপূর্ণ হয়েছে।

---

[৩২]. হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা, ১/১৩৩
[৩৩]. এজালাতুল খেফা, ২/৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কুরআনের আলোতে প্রজ্ঞা

কুরআন শরীফে আলেম এবং যারা আলেম নয় উভয়ের পার্থক্য পরিস্কার দেওয়া হয়েছে[৩৪] এবং আলেম-ওলামার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৫] উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের উচ্চ মর্যদার কথা।[৩৬] এবং এটাও বলা হয়েছে প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর আরোও বড় জ্ঞানী রয়েছেন।[৩৭] ইল্ম ব্যতীত কুরআনে হাকিমের মধ্যে হিক্মতের কথা উল্লেখ রয়েছে। উহার ব্যাপারটাই তো আলাদা। ইরশাদ হচ্ছে 'আল্লাহ্ হিক্মত দান করেন যাকে চান এবং যে হিক্মতপ্রাপ্ত হয় সে অনেক মঙ্গলের অধিকারি।'[৩৮] জানা গেল যে হিক্মত বিশেষ এক অনুগ্রহ আর তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যাদের অন্তরে আল্লাহ্ হিক্মত দান করেছেন তারা বেহেশ্তবাসি।'[৩৯] এটাও ইরশাদ করেছেন, 'যার ব্যাপারে আল্লাহ্ মঙ্গলের ইচ্ছে করেন তাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন।'[৪০]

এই হিক্মতই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ করা হয়[৪১] এবং নিজের বিশেষ শিষ্যদেরকে এই হিক্মত শিক্ষা দিয়েছেন।[৪২] এই হিক্মত যখন পূর্ণঙ্গতা লাভ করে[৪৩] তখন তার স্বীয় রং পরিদৃষ্ট হয় এবং তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই হিক্মতওয়ালারা হলেন ঐ সব ইল্ম ও জিকিরকারী যাদেরকে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যা তোমাদের বুঝে আসেনা সেটি তোমরা জিকিরওয়ালাদের কাছ থেকে জেনে নিও।[৪৪] হ্যাঁ এই জিকিরকারী আল্লাহ্র অনুগ্রহসমূহের কৃতজ্ঞতা আদায় করেন, তারা আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদেরকে স্মরণকারি, আল্লাহ্র কিতাব অধ্যায়নকারী, আল্লাহ্র দিবসকে বিশ্বাসকারী, আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও অবদানকে স্বীকারকারী। হ্যাঁ, কস্মিকালেও যেন তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে অমুখাপেক্ষি ভাব যেন দেখানো না

---

[৩৪]. আল-কুরআন, সূরা কাসাস, আয়াত : ৮০, সূরা রূম, আয়াত : ৫৬, সূরা সাবা, আয়াত : ৬০
[৩৫]. আল-কুরআন, সূরা আনকবুত, আয়াত : ৪৩, সূরা শুআরা, আয়াত : ১৯৭, সূরা ফাতির, আয়াত : ২৮
[৩৬]. আল-কুরআন, সূরা মুজাদালাহ, আয়াত : ১১
[৩৭]. আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৭৬
[৩৮]. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ৫৯
[৩৯]. মুসনদে ইমামে আযম, লাহোর, পৃষ্ঠা : ৩৮
[৪০]. বুখারী শরীফ, ১/২৪
[৪১]. আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত : ১১৩
[৪২]. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ১৫১, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৬৪, সূরা জুমা, আয়াত : ২
[৪৩]. আল-কুরআন, সূরা কমর, আয়াত : ৫
[৪৪]. আল-কুরআন, সূরা নাহল, আয়াত : ৪৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হয়, সর্বদা তাদের নেয়াজমন্দ থাকতে হবে। কেননা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা তাদের কাছে রয়েছে, وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُوْنَ (অর্থাৎ জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও দ্বীন সম্পর্কে অনুধাবন শক্তি ওলামায়ে রব্বানীদের নিকটই রয়েছে।)[৪৫] সকলের নিকট নয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'রব্বানী হও তোমরা আলেম এবং ফক্বীহ হও।'[৪৬]

কুরআন শরীফে প্রশ্ন করা হয়েছে যে জ্ঞানী এবং মূর্খব্যক্তি কি এক সমান[৪৭] অর্থাৎ কুরআন, হাদিস এবং ফিক্বাহ্ যারা জানেন আর যারা জানেননা। মুজতাহিদ ও মুহাদ্দিস হলেও ঐ সমস্ত লোকগণ যাদের ব্যাপারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা ঐ সব লোকদের মধ্য থেকে হও যাদের সাথে থাকার জন্য আমি আদৃষ্ট হয়েছি।[৪৮] আমরা পোক্তা ইল্মের অধিকারী।[৪৯] তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে। এবং যদি সে ব্যাপারে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং নিজেদের বিচক্ষণ লোকদের কাছে রুজু করলে তাহলে অবশ্যই তাদের কাছ থেকে ঐ বিষয়টির তাৎপর্য জানতে পারতো যে প্রয়াসটা তারা পরে গ্রহণ করে থাকেন।[৫০] এই বিচক্ষণ ব্যক্তিরা হলেন পাকাপোক্ত ইল্মওয়ালা। এই হিকমতওয়ালারা হলেন যাদের প্রশংসা করেছেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যারা প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন সে তো শিক্ষা দিবেন এবং নিজেদের পক্ষ থেকে কোন রকম লৌকিকতা প্রদর্শন করবেনা।[৫১] বাস্তব কথা হলো, শাসকগণ ওলামাদের অনুসরণকারী। এজন্য কুরআন শরীফে যে সব উলিল আমরের আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে তারা হলেন ওলামায়ে হক।[৫২] শাসকগণ তো কেবল বিধি-বিধান প্রয়োগ করবেন আর ওলামারা হলেন বিধানদাতা। হ্যাঁ, তাদের অনুসরণের আদেশ দেয়া হয়েছে আমাদেরকে এবং বলা হয়েছে তারা হলেন, رَاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ। তাদের জন্য বলা হয়েছে কুরআনের আয়াতসমূহের রহস্য ও

৪৫. আল-কুরআন, সূরা আনকবুত, আয়াত : ৪৩
৪৬. গারায়েবুল বয়ান, পৃষ্ঠা : ২৩০, বুখারী শরীফের উদ্বৃতি দিয়ে।
৪৭. আল-কুরআন, সূরা যুমার, আয়াত : ৯
৪৮. মুসনদে ইমামে আযম, লাহোর, পৃষ্ঠা : ৩৭
৪৯. আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত : ৬২
৫০. আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত : ৮৩
৫১. বুখারী শরীফ, খন্ড : ৩, অধ্যায় : ১২১৬, পৃষ্ঠা : ৮৬৭, লাহোর থেকে প্রকাশিত
৫২. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৭, সূরা নিসা, আয়াত : ১৬২

তত্ত্ব رَاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ জানেন[৫৩] এবং رَاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ হলেন তারা, যারা বক্ষের ইল্ম অর্থাৎ উপকারি ইলমে সাজসজ্জিত। যে সেই رَاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ হতে পারেনা। এখানে শুধু ব্রেইন-বুদ্ধি যথেষ্ট নয়, এখানে প্রয়োজন রয়েছে অন্তরের, বরং একমাত্র অন্তরের। কেননা প্রত্যেক আয়াতের রয়েছে যাহের ও বাতেন এবং প্রত্যেকের রয়েছে শুরু এবং শেষ। আমরা তো সেটা জানিনা যেটা আমাদের সামনে আছে, তাহলে আর কি জানবো? ভিতরের বিষয়গুলো জানা সহজ কাজ নয়। প্রত্যেক কিতাবে রয়েছে বাতেন বা ভিতরগত বিষয়, তাকে জানা ব্যতীত কিতাবকে জানা সম্ভব নয়। এজন্যই তাদেরকে মেনে চলার আদেশ দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে, আমাদের পূর্বে আমাদের ইমাম রয়েছে, যাদের অনুকরণ আমরা করি আর পরবর্তীগণ আমাদের অনুকরণ করবে।[৫৪] এই হাদিসের আলোকে ফক্বীহ্দেরকে ইমাম বলা হয়েছে এবং যারা তাদের পিছু অনুসরণকারী তাদেরকে বলা হয় মুকাল্লিদ। এটি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, যে দিকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশারা করেছেন। কুরআন থেকে জানা যায় যে, দ্বীনের অনুআবূ শক্তির অধিকারী এবং কুরআন-হাদিস থেকে মাসআলা সমূহের আবিস্কারকগণ তারা অন্যরকম।[৫৫] এ কাজ যার তার নয় এবং কুরআন-হাদিস থেকে শরীয়তের বিধান অনুসন্ধান করা সকলের কাজ নয়। সে অনুসন্ধানকারীরা তো ভিন্ন এক শ্রেণীর মানুষ, আল্লাহ্র সাহায্য যাদের পানে উন্মুক্ত রয়েছে।[৫৬] যারা সমালোচকের নিন্দা জ্ঞাপনকে আমলে নেয় না।[৫৭] সেটাই উচ্চারণ করে যেটা সত্য। যারা বক্তব্য কর্মে আল্লাহ্র 'বোরহান' স্বরূপ। আমরা কি আর আমাদের জ্ঞানই বা কি? আমরা তো আরবীই জানিনা, আমরা তো কুরআন-হাদিসের ইল্ম সম্পর্কে জ্ঞাত নই। কিন্তু মা'শা আল্লাহ্ কথা তো অনেক বলি।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস থেকে মাস্য়ালা-মাসায়িল বেরকারী মুজতাহিদ ফক্বীহ্দের একটি সূক্ষ্ম উপমা দিয়েছেন। হযরত আবূ মুসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু (৪৪ হি./৬৬৪ ইং) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হেদায়েত এবং দ্বীন দিয়ে আল্লাহ্ আমাকে

৫৩. আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত : ৫৯
৫৪. বুখারী শরীফ, খন্ড : ৩, অধ্যায় : ১২০৫, পৃষ্ঠা : ৮৪৮, লাহোর থেকে প্রকাশিত
৫৫. আল-কুরআন, সূরা তাওবা, আয়াত : ১২৩, সূরা নিসা, আয়াত : ৮৩
৫৬. আল-কুরআন, সূরা আনকবুত, আয়াত : ৬৯
৫৭. আল-কুরআন, সূরা মায়েদাহ, আয়াত : ৫৪

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পাঠিয়েছেন। তার উদাহরণ হলো বৃষ্টির ন্যায়, যা জমিনে পতিত হয়। জমিনের যে অংশটি খুবই উর্বর সেটি যথেষ্ট পানি পান করেছে, ঘাস ও সব্জি ভাল উৎপন্ন করেছে আর অন্য অংশটি পানিকে ধারণ করে ফেলেছে, তার দ্বারাই আল্লাহ্ অন্যকে উপকার পৌঁছিয়েছে নিজে পানি পান করেছে এবং অন্যদেরও তৃপ্ত করেছে। কিন্তু জমিনের একটি অংশ যেটি মরুভূমি সে পানিও ধারণ করতে পারেনি, ঘাসও উৎপন্ন করেনি। এই উদাহরণ ঐ ব্যক্তির যে আল্লাহ্র দ্বীনকে যথাযথ অনুধাবন করতে পেরেছে, আল্লাহ্ তাকে দ্বীন দ্বারা উপকৃত করেছেন সে নিজে শিক্ষা করেছেন অপরকেও শিক্ষা দিয়েছেন।[৫৮]

কুরআন ও হাদিসের আলোকে তাক্বলীদ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'অতঃপর আমি তোমার উপর ওহী প্রেরণ করেছি এই কথার যে, ইব্রাহিমের দ্বীনকে অনুসরণ করো যিনি প্রত্যেক বাতিল থেকে আলাদা ছিলেন এবং মুশরিক ছিলেন না।'[৫৯] ইব্রাহিমের দ্বীনই হলো ইসলাম ধর্ম। যেটি প্রথম দিন থেকে চলে আসছিল। যার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকট একমাত্র দ্বীন হলো ইসলাম।'[৬০] ইহুদি এবং খৃষ্টানরা পৃথক পৃথক রাস্তা গ্রহণ করেছেন আর মানুষদেরকে সে দিকে আহ্বান করেছেন। তার উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'এবং কিতাবিরা বললো ইহুদি ও খৃষ্টান হয়ে যাও, তবে হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়ে যাবে, তোমরা বলে দাও আমরা তো ইব্রাহিমের ধর্ম মানি, যিনি প্রত্যেক বাতিল থেকে আলাদা ছিলেন এবং মুশরিক ছিলেন না।'[৬১] আল্লাহ্র নিকট ইহুদি এবং খৃষ্টানবাদের কোনো হাকিক্বত নেই, শুধু মুসলমানরা একটি বাস্তবতার নাম, যে নাম রেখেছেন হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম।[৬২] এ সব আয়াত থেকে একদিকে জানা গেল যে 'তাক্বলীদে শাখসী' বা ব্যক্তি অনুকরণ ফরজ। এমনটা না হলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এটা করতে বলা হতো না। অন্যদিকে যেটা জানা যায় তা হলো, সিরাতে মুস্তাকিমের উপর যাত্রাকারীদের কথা এবং ইল্ম ও আমলের নিদর্শনগুলো মিটানো যাবেনা। কেননা সেটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার একটি অংশ। ইসলাম ধর্ম হযরত আদম থেকে চলে

[৫৮]. বুখারী শরীফ, ১/৫০ (মুহাম্মদ আলী - ৫০)
[৫৯]. আল-কুরআন, সূরা নাহল, আয়াত : ২৩
[৬০]. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৯
[৬১]. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ১৩৫
[৬২]. আল-কুরআন, সূরা হজ্ব, আয়াত : ২৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আসছে, যিনি নুরে মুহাম্মদীর আমানত সংরক্ষণকারী ছিলেন। প্রত্যেক নবী এবং রাসূল এই ইসলামকে তুলে ধরেছিলেন। হাজার বর্ষ পরম্পরায় উন্নয়নের মন্যিলসমূহ অতিক্রম করে মহানবীর যুগে সেই ইসলাম ধর্ম পরিপূর্ণতা লাভ করে। অতঃপর ঘোষণা করা হলো, 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিলাম।'[৬৩]

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগতিক অস্তিত্বের সূচনা পয়েন্ট।[৬৪] তিনি সৃষ্টির মধ্যে প্রথম আর জন্মে পরে। ইসলামের তিনি সূচনা আবার তিনি তার পরিসমাপ্তি। তিনি ইসলামের যাত্রার শুরু আবার শেষও বটে। সুবাহানাল্লাহ্! সুবহানাল্লাহ্!

কুরআন শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দ্বীনি ইব্রাহিমীকে মেনে চলতে বলা হয়েছে।[৬৫] হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তো অনুকরণ করার দরকার ছিলনা। কিন্তু আসলে এটাই বুঝানো হচ্ছে যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে চালু রাখতে হবে। সাহাবাগণ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করেছেন। যে মাসআলা সামনে আসতো তাঁর কাছ থেকে জিজ্ঞাস করতেন। কুরআন শরীফে এটা উল্লেখ রয়েছে।[৬৬] হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ সাহাবীগণ বড় সাহাবাদের কাছে জিজ্ঞেস করতেন। এভাবে লক্ষাধিক সাধারণ সাহাবী বড় সাহাবাদের মুকাল্লিদ বা অনুসারী ছিলেন। অথচ সকলেই তো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন লাভ করেছেন এবং তাঁর কথা শুনেছিলেন। কিন্তু দ্বীনের বুঝ তো অন্য এক জিনিসের নাম, যা বড় সাহাবাদের অবস্থানকে তুলনাহীন গড়ে তুলেছে। এরপর সাহাবাদের তাক্বলীদ করলেন যারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ লাভ করেননি, যাদেরকে আমরা তাবেঈ বলে স্মরণ করি। অতঃপর তাবেঈগণের তাক্বলীদ করলেন, যারা সাহাবাদেরকে দেখননি যাদেরকে আমরা তাবয়ে তাবেঈন বলে থাকি। শতাব্দী পর শতাব্দী কান এবং মুখের মাধ্যমে ইল্মের প্রচার-প্রসার হয়ে আসছিলো। কাগজ-কলম

[৬৩]. আল-কুরআন, সূরা মায়েদাহ, আয়াত : ৩
[৬৪]. ফতোয়া হাদিসিয়া, পৃষ্ঠা : ১৮৯, মওয়াহিবুল লুদুনিয়া, ১/৫৫, যুরকানী, ১/৪৬ (মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকের উদ্বৃতি দিয়ে।
[৬৫]. আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত : ১২৫
[৬৬]. আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত : ১২৭, ১৭৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অপ্রতুল ছিল। লেখকের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। কিতাবসমূহ সাধারণভাবে সহজলভ্য ছিলনা। কেউ কিতাব নিতে চাইলে কিতাবটি অনুলিপি করার জন্য হস্তলিপিকারদেরকে লাইব্রেরীসমূহে মাসের পর মাস বসে থাকতে হতো। আর এভাবে একটি কিতাব হাতের নাগালে আসতো। পুস্তক সমাহারের এই জামানায় আমরা অতীতের ঐ সব সংকটের কথা চিন্তাও করতে পারিনা। যখন অবস্থা এমনি হৃদয় বিদারক ছিল তখন সাধারণ মুসলমানরা আলেম, মুহাদ্দিস এবং ফক্বাহবীদদের থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়ার কল্পনাও করতে পারতো না। ১৪শ শতাব্দী পর্যন্ত তাক্বলীদ থেকে ছাড়া পাওয়ার কোন আওয়াজ উঠেনি। স্বাধীনতার যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে। শুরু হলো দাসত্বের জামানা। প্রত্যেক জায়গা থেকে মনগড়া বক্তব্যদানকারীরা বেরিয়ে পড়লো। তরুণ যারা পূর্ব থেকেই দিশাহারা ছিল তারা এ সব কথাবার্তা শুনে আরোও বেশি হতাশ হয়ে পড়লো। ইকবাল সত্যই বলেছেন,

کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر

'দাসত্ব পাল্টে দেয় জাতির অন্তরাত্মা'

নিশ্চয় তাক্বলীদ একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, যা চলমান ছিল এবং সে ধারাবাহিকতার দিকে ইঙ্গিত করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সর্বোত্তম যুগ আমার যুগ অতঃপর পরবর্তী যুগ এবং অতঃপর তার পরবর্তী যুগ।'[৬৭] যাদেরকে আমরা চার ইমাম বলি তারা সেই মোবারক সময়কালের লোক ছিলেন। যদিও অধিকাংশ লোক এ কথা জানেনা। হযরত ইমাম আবূ হানিফা[৬৮] তাবঈদের যুগে জন্ম হয়েছিলেন এবং সেই যুগে ইন্তেকাল করেছেন। যার অর্থ হলো 'খায়রুল কুরুন' এ জন্ম নিয়েছেন এবং সে সময় ইন্তেকাল করেছেন। যে মোবারক জামানাকে অন্য জামানার উপর শ্রেষ্ঠত্বের সুসংবাদ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজেই দিয়েছেন। ইমাম মালেক[৬৯] তাবঈদের যুগে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং

৬৭. মিশকাত শরীফ, কিতাবুল মানাকিব, باب مناقب الصحابة হাদিস : ৪

৬৮. উক্ত কিতাবের ৫ম অধ্যায় ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর দ্বীনি খেদমাতের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। বিস্তারিত সেখানে দেখুন।

৬৯. ইমাম মালেক ইবনে আনাস রাহমতুল্লাহি আলাইহির পরদাদা আবু আমের ইসলামের সৌভাগ্য হাসিলের পর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছেন। তিনি বদর যুদ্ধ ছাড়া সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর (ইমাম মালেক) দাদা আবু আনাস মালেক ইবনে আবি আমের শীর্ষ তাবেয়ীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। প্রসিদ্ধ মতে, ইমাম মালেক মদীনায় ৯৩ হি. মুতাবিক ৭১১ খ্রীস্টাব্দতে জন্ম গ্রহণ করেছেন। ইবনে শিহার জুহরী এবং ইমাম জাফর সাদেক ছাড়াও তাঁর বহু শিক্ষক ছিল। তিনি পবিত্র

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাবেঈদের যুগে ইন্তেকাল করেছেন। ইমাম শাফেয়ী[৭০] এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল[৭১] তাবঈদের যুগে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তাবে তাবঈনদের যুগে ইন্তেকাল করেছেন।

মদীনাতেই পুরো জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। আশি বছর বয়সে আল্লাহর সান্নিধ্যে গমন করেন এবং জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি আব্বাসী খলিফা মনসুরের (মৃত্যু ১৩৬ হি./১৫৮ ইং) আদেশে আল-মুয়াত্তা নামক বাছাইকৃত দশ হাজার হাদিসের একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যা খলিফা মাহদীর (মৃত্যু ১৫৮ হি./ ১৬৯ ইং) সময়কালে ব্যাপক হারে প্রসার লাভ করেছিল। তিনি হাদীসের একজন ইমাম ও রিজাল শাস্ত্রের একজন সনদ ছিলেন। নিম্মোক্ত ভূখন্ডে তার মাযহাব প্রসার লাভ করেছে। পবিত্র মদীনা, মাশরিকে উলা, বসরা, মাশরিকে আকসা, মিসর, উত্তর আফ্রিকা আর স্পেন, সুদান, বাহরাইন, কুয়েত ও মরক্কো ইত্যাদি নগরীতে মালেকী মাযহাবের অনুসারীদের সংখ্যা চারকোটি। (ইসলামিক ইন্সাইক্লোপেডিয়া পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি, লাহোর, খন্ড : ১৮, পৃষ্ঠা : ৩৭২ সংক্ষিপ্তাকারে)

৭০. ইমাম শাফেয়ীর (মৃত্যু : ২০৪ হি./ ৮১৯ ইং) ১৫০ হি. মুতাবিক ৭৬৭ ইং তে গাজায় (ফিলিস্তিন) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শিশুকালেই তিনি অনাথ ও এতিম হয়ে গিয়েছিলেন। দশ বছর বয়সে ইমাম মালেক এর আল-মুয়াত্তা মুখস্ত করে নিয়েছিলেন। পনেরো বছর বয়সে ফতওয়া প্রদান করার এজাযত লাভ করেন। ১৩ বছর বয়সে জ্ঞানার্জনের জন্য মদীনায় ইমাম মালেক রাহমতুল্লাহি আলাইহির নিকট গমন করেন এবং তাঁর নিকট মুয়াত্তা পড়তে থাকেন। ইমাম মালেক রাহমতুল্লাহি আলাইহির ইন্তেকালের পর মুসলিম ইবনে খালেদ আল যানজী (মৃত্যু ১৮০ হি. /৭৯৬ ইং) সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ (মৃত্যু ১৯৮ হি./৮১৩ ইং) এবং হাদীস শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ আলেমদের থেকে হাদীস ও ফিকহের জ্ঞান লাভ করেন। পরে ইমাম মুহাম্মদ হাসান শায়বানীর (মৃত্যু ১৮৯ হি./ ৮০৪ ইং) মত বিখ্যাত ফকীহ এবং মুহাদ্দিসের অন্যতম শিষ্যে পরিণত হলেন। তিনি পবিত্র মক্কা, বাগদাদ এবং মিসর সহ অন্যান্য এলাকার জ্ঞানের প্রচার-প্রসারে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর ইলমী কর্মকান্ডের প্রধান কেন্দ্র চিল বাগদাদ ও কায়রো। তিনি ২০৪ হি./৮২০ ইং ইন্তেকাল করেন। তিনি তাঁর আর-রিসালাহ নামক গ্রন্থে উসুল ও ফিকহ বিষয়ক যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। তাঁকে উসূলে ফিকহর প্রথম পুরুষ সাব্যস্ত করা হয়। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তাঁর ব্যাপারে বলেন, এই কোরাইশ বংশীয়া যুবক থেকে আল্লাহর কিতাবের বড় ফকীহ আমি আর দেখিনি। তাঁর অধিকাংশ পুস্তিকা 'কিতাবুল উম' নামক গ্রন্থের সাথে সংযোজিত করে দেয়া হয়েছে, যা কায়রোতে সাত খন্ডে (১৩২১-১৩২ হি.) প্রকাশিত হয়েছে। অপর আর-রিসালাহ নামক গ্রন্থটি নেদারল্যান্ড এর ভাষায় সংক্ষিপ্তাকারে অনুবাদ প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৬১ ইংরেজীতে মজীদ আল মযুরী একটি ভূমিকা সহকারে ইংরেজী ভাষায় অনূদিত করেছেন। ১৯৬৮ ইংজীতে মুহাম্মদ আহমদ আলী করাচীতে তার উর্দূ অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে তাঁর ছাত্র হিসেবে গণ্য করা হয়। (ইসলামিক ইন্সাইক্লোপেডিয়া, পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি, লাহোর খন্ড : ১১, পৃষ্টা : ৫৭৬ সংক্ষিপ্তাকারে)

৭১. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমতুল্লাহি আলাইহি (১৬৪ হি. মুতাবিক ৭৮০ ইং) বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানেই তিনি হাদিস, ফিকহ শাস্ত্র ও অভিধান বিদ্যা জ্ঞানার্জন করেন। অতঃপর ১৭৯ হি./৭৯৫ ইং থেকে হাদীস শাস্ত্রের জ্ঞান লাভে নিজেকে রিয়োজিত রাখেন এবং তিনি হাদীস শাস্ত্রে বুৎপত্তি লাভের উদ্দেশ্যে হিজাজ, ইরাক, ইয়েমন ও সিরিয়া ইত্যাদিতে গমন করেন। ১৮৩ হি./৭৯৭ ইং সালে কুফা গমন করলেন। তবে অধিকাংশ বসরাতেই অবস্থান করতেন। একাধিক বার হজ্ব করেছিলেন। মদীনা মুনাওয়ারার সুশীতল ছায়াতেও আশ্রয় লাভের সৌভাজ্য অর্জন করেন। তিনি বাগদাদে ইমাম আবু হানিফা রাহমতুল্লাহি আলাইহির শিষ্য কাযী আবু ইউসুফ (মৃত্যু ১৮২ হি./৭৯৭ ইং) এর দরসে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (মৃত্যু ১৯৮ হি./ ৮১৪ ইং) এর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি আদ্যান্ত শিক্ষক ও পাঠদানের কাজেই নিয়োজিত ছিলেন। ২৯১ হি. ৮৫৫ ইং সালে ৭৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন এবং বাগদাদে সমধিত হন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ছিলেন তার সময়ের মুজতাহিদ। তিনি শুধু ফকীহ বা মুহাদ্দিস ছিলেন না; বরং তিনি এমন মুহাদ্দিস ছিলেন তাঁর ফিকহের ভিত্তি রচনা করেছেন হাদীসের উপর।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

চিন্তা করলে জানা যায়, চার ইমামের সকলেই খায়রুল কুরুনে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং সে যুগেই জীবন অতিপাত করেছেন, যে যুগ সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্যারেন্টি দিয়েছেন, যাদের অনুসারীরা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে এবং যাদেরকে 'ছাওয়াদে আযম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত' বা বৃহত্তম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত গোষ্ঠী বলা হয়। ঐ চার মাযহাবের[৭২] (ইসলামী চিন্তারধারা সমূহ) সূত্র ছিল তাই যেটা নববী যুগ এবং সাহাবাদের জামানায় ছিল। অর্থাৎ কুরআন, হাদিস, ইজমা এবং কিয়াস। মানুষ নিজেই ভেবে দেখতে পারে যে, খায়রুল কুরুন বা উত্তম যুগের ব্যক্তিবর্গরা কি অনুসরণীয়, না মন্দযুগের ব্যক্তিবর্গরা। সাহাবায়ে ফোরামগণ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজ চোখে দেখেছেন, স্ব-কানে শুনেছেন তাঁর কথা। তাঁরা তো বলতে পারতেন যে আমরা তো স্বয়ং হুযূরকে দেখেছি এবং তাঁর মুখ থেকে শুনেছি আমাদের জন্য কাউকে অনুকরণ করার দরকার নেই। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ এমন কথা বলেননি; বরং সাহাবাদের মধ্যে যারা বড় এবং ফকীহ ছিলেন তাদের অনুকরণ করেছেন। কেননা এটাই ছিল কুরআনের হুকুম।[৭৩] আর তাই একথা বলতেই হয় যে তাক্বলীদ রাসূলেরও সুন্নাত এবং সাহাবাদের, তাবেয়ীদেরও আদর্শ এবং তবয়ে-তাবেয়ীদের আদর্শ এবং সকল নেককার লোকগণেরও আদর্শ।

এ কথা মনে রাখতে হবে যে, এই তাকলীদ কোন নতুন বস্তু নয়। বরং তাকলীদ না করাই হলো নতুন ব্যাপার এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাদের আদর্শের পরিপন্থী। যারা তাকলীদ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়, যারা আমাদেরকে আমাদের অতীত থেকে দূরে ঠেলে দিতে চায় এবং যারা অতীত থেকে দূরে সরিয়ে বর্তমানে আঁধারে পথহারা করিয়ে দিতে চায় তারা হিতাকাঙ্খী হতে পারেনা। একটু সামান্য লক্ষ্য করুন- হযরত

উল্লেখ্য কোরআনের মাযহাবলীর ব্যাপারে হাম্বল আকীদা হল, যখন কেউ কোরআন পাঠ করে তখন বা কেউ যখন তা লিখে সর্বাবস্থায় তা বাস্তবিকভাবেই আল্লাহর কালাম থাকে। কারণ কালাম বা কথার সম্পৃক্ততা তো ওই মহান সত্ত্বার সাথে, যিনি তা উদ্ভাবন করেছেন ওই ব্যক্তির প্রতি নয় যে শুধু পৌঁছিয়ে দিয়েছে বা আদায় করেছে। "যে কোন কথার সত্ত্ব ও সম্পর্ক তার উদ্ভাবকের সাথে, তার সাথে নয় যে বার্তাবাহক মাত্র।" (আল ওয়াসেতিয়্যাহ, কায়রো, ১৩৪৬ হি., পৃষ্ঠা : ২১-২২ সংক্ষেপে) (ইসলামিক ইন্সাইক্লোপেডিয়া পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি, লাহোর খন্ড : ২, পৃষ্টা : ৬১ সংক্ষিপ্ত)

সউদী আরবের সউদ পরিবার হাম্বলী মাযহাবের অনুযায়ী তবুও কেন জানি না তারা কুরআনের মূল অর্থ ও ভাবটিকে কুরআন মনে করেন, কিন্তু শব্দাবলীকে কোরআন মনে করেন না এবং তার যথোচিত সম্মান করেন না। অথচ ইসলামের সোনালী যুগ থেকেই এসব শব্দাবলীকে কুরআনের মর্যাদা দিয়ে আসছে।

[৭২]. এখানে মাযহাব দ্বারা উদ্দেশ্য চিন্তা-গবেষণার নিয়ম-পদ্ধতি, দ্বীন নয়। দ্বীন তো একমাত্র ইমলামই।

[৭৩]. আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত : ১২৫

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণকে কুরআন পড়িয়ে শুনিয়েছেন। তাদের কুরআন পড়া শিক্ষা দিয়েছেন। তাদের অন্তর পাক করেছেন এবং প্রজ্ঞার সবক দিয়েছেন।[৭৪] তাদেরকে পরবর্তী আগমনকারীরা এ দায়িত্বটুকু একজন একজন করে সামাল দিয়েছেন। হাফেজ এবং ক্বারীগণ কুরআন পড়া শিক্ষা দিয়েছেন। ওলী এবং সৎলোকগণ অন্তরগুলো পাক-পবিত্র করেছেন। ওলামা ও ফকীহগণ জ্ঞান ও দ্বীনের বুঝ শিখিয়েছেন। তাঁরা সকলে এ বাস্তব ধারাবাহিকতাকে বাকি রেখেছেন যার সূচনা করেছিলেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমরা তাদেরকে ছেড়ে দিয়ে ঐসব লোকের আনুগত্য কেন করব, যারা বিশ্বাসের পথ চলার পর আবার সংশয়ের পথে যাত্রা করে। এরা নববী যুগ থেকে চলে আসা ধারবাহিকতাকে মিটিয়ে দিতে খড়্গ হস্ত।

ইমাম আবূ হানীফা রাদিয়াল্লাহু আনহু : অবদান ও জীবন বৃত্তান্ত

ইমাম আবূ হানীফা নোমান বিন সাবেত বিন নোমান বিন মিরজবান (অথবা যূতী)[৭৫] পারস্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং অন্য বর্ণনা মতে, পারস্য রাজ পরিবারের লোক ছিলেন। ইমাম আবূ হানিফার পরদাদা পারস্য থেকে হিজরত করে কুফায় এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। যে কুফা নগরী ফুরাত নদীর তীরে অবস্থিত এবং ১৭ হি./৬৩৮ ইং হযরত ওমরের[৭৬] নির্দেশে হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস যে নগরীটিকে আবাদ করেছিলেন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দুর্দৃষ্টি সেটাই অবলোকন করতে পেরেছে যেটা অন্যদের দৃষ্টি গোচর হয়নি। তিনি 'কুফা' কে এসব উপাধি দ্বারা ভূষিত করেছেন-

كَنْزُ الإِيْمَان (ঈমানের মূলধন),[৭৭] رَأْسُ الإِسْلَامِ (ইসলামের মুকুট), رَأْسُ الْعَرَبِ (আরবের তাজ)।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আগেই লক্ষ্য করে ফেলেছেন যে, এই নগরটি ভবিষ্যতে সাহাবা, তাবেয়ী, তাবয়ে-তাবেয়ী, মুজতাহিদ এবং

[৭৪]. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৬৪, সূরা জুমা, আয়াত : ২

[৭৫]. বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, আত তাবকাতুল কুবরা, ৬/৩৬৮, তারিখে বাগদাদ, ৩/৩২৩, আল-মিযান, ৪/২৬৫, আত তাহযিব, ১০/৪৪৯, তারিখে ইবনে মুঈন, ২/৬০৭, আত তাকরীব, ২/৩০৩, আল-ফেহরেস, পৃষ্ঠা : ২৮৪-২৮৫, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৬/২০৩, ৩৯০

[৭৬]. মুহাম্মদ আলী : ইমামে আযম আওর ইলমে হাদিস, সিয়ালকুট, পৃষ্ঠা : ১৪৬

[৭৭]. মুহাম্মদ আলী সিদ্দীকি : ইমামে আযম আওর ইলমে হাদিস, লাহোর, ১৯৮১ ইং

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মুহাদ্দিসগণের একটি বড় কেন্দ্রে পরিণত হবে। ১৭ হি./৬৩৮ সালে হযরত সা'দ বিন ওয়াক্কাস চল্লিশ হাজার মানুষকে নিয়ে মাদায়েন এলাকা ত্যাগ করে কুফা নগরীতে বসবাস শুরু করেন। এভাবে বলা যায় যে কুফার প্রথম আধিবাসন শুরু হয় সাহাবা এবং তাবেয়ীগণ দ্বারা। হযরত আলী, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং আম্মার ইবনে ইয়াসিরের মত বড় বড় সাহাবাগণ এখানে বসবাস করতেন।[৭৮]

ইবনে সা'দের মতে, এক হাজার পঞ্চাশ জন সাহাবা তম্মধ্যে ২৪ জন বদরী সাহাবা কুফায় তাশরীফ রেখেছিলেন।[৭৯] ২০ হি./৬৪০ সালে হযরত ওমর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে কুফায় পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর সম্পর্কে হযরত ওমর মন্তব্য করে বলেন, তিনি ইলম দ্বারা ভরপুর একটি পাত্র।[৮০] তার অবস্থানের দরুন কুফা ইলম ও হাদীসের কেন্দ্র ছিল। ইবনে তাইমিয়া সত্যই বলেছেন, মক্কা, মদিনা, বসরা এবং সিরিয়া এই পাঁচটি নগরী এমন যেখান থেকে নবী ইলম অর্থাৎ ঈমানী এবং কুরআনী ইলম নির্গত হয়েছে।[৮১]

ইয়াকুতে হামভী সুফিয়ান বিন উয়াইনা ১৯৮/৮১৩ থেকে বর্ণনা করেন যে কুরআন মদীনাবাসী থেকে এবং হালাল হারাম কুফাওয়ালাদের নিকট থেকে শেখা হোক।[৮২] মোটকথা মর্যাদা ও মহত্ত্বের দিক দিয়ে কুফা ইসলামের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানেই ৮০ হি./৬৯৯ ইং সালে ইমাম আবূ হানিফা জন্ম লাভ করেছেন। এটাই হযরত আলীর দারুল খিলাফা (রাজধানী) ছিল। আরব আজকের মিলনস্থান এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র ছিল।

ইমাম আবূ হানিফার দৌহিত্র ইসমাঈল বিন হাম্মাদের (২১২ হি:/৮২৭ ইং) মতে, তার দাদা নোমান বিন মিরজবান পারস্যবাসী ছিলেন।[৮৩] তার দাদার নাম ছিল নোমান। সম্ভবত তার উপাধি ছিল যূতি আর এজন্য হইতো বা তার বংশ হিন্দুস্থানের একটি গোত্র 'জাট' এর সাথে সম্পৃক্ত। দাদার নামে ইমাম আবূ হানিফার নাম রাখা হয় নোমান। এটি লাল গোলাবের একটি ফুলের নাম, মন মুগ্ধকর তার সুগন্ধি। বসন্তের শুরুতে পাহাড়ের পদদেশে যা

৭৮. আল-এলান বিত তাওবিখ, পৃষ্ঠা : ৯২
৭৯. তাবকাতে ইবনে সা'দ, ২/৪
৮০. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ, পৃষ্ঠা : ১৪
৮১. মিনহাজুস্ সুন্নাহ, ৪/১৪২
৮২. মু'জামুল বুলদান, ২/৬৪
৮৩. উকুদুল জিমান ফিল মানাকিবিল ইমামে আযম আবু হানিফা আন নোমান, ১৩/৩২৬

পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে।[৮৪] ইমাম আবূ হানিফা ইসলামের প্রথম বসন্তে জন্ম লাভ করেছিলেন এবং স্বীয় খোশবু সারা জগতকে মাতোয়ারা করেছেন। আর যদি 'নোমান' শব্দটি ধাতুগতভাবে 'নিয়ামত' থেকে উৎপত্তি হয়, তাহলে বলা যায় যে ইমাম আবূ হানিফা মুসলমানদের জন্য এক মহা নিয়ামত ছিলেন।[৮৫]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'সর্বোত্তম ব্যক্তিরা আমার যুগের তারপর দ্বিতীয় যুগের তারপর তৃতীয় যুগের।'[৮৬]

প্রথম যুগটির সময়কাল ১১০ হিজরী পর্যন্ত ছিল। সে যুগে ইমাম আবূ হানিফা জন্মগ্রহণ করেন। সর্বশেষ সাহাবীর ইন্তেকালের সময় হযরত আবূ হানিফার বয়স ছিল ৩০ বছর। অন্য এক বর্ণনা মতে, তখন তাঁর বয়স ছিল ৫১ বছর। অর্থাৎ তাঁর জন্ম ছিল প্রথম যুগে আর তাঁর মৃত্যু ছিল দ্বিতীয় যুগে। মোটকথা তাঁর সময়কালটা ছিল খায়রুল ক্বুরুনের জামানা।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'এমন লোকদের অগ্নি স্পর্শ করবেনা যারা আমার দর্শন লাভ করেছে অথবা আমাকে যারা দেখেছে তাদের দর্শন লাভ করেছে।'[৮৭]

একটি হাদীকে একথা বলা হয়েছে, 'সাহাবা এবং তাবেয়ীগণের বরকতে মুসলমান সৈন্যবাহিনী বিজয় লাভ করে থাকে।'[৮৮]

ইমাম আবূ হানিফার দাদা তাঁর পিতা সাবেতকে শৈশবকালেই কুফায় হযরত আলীর দরবারে নিয়ে আসে। হযরত আলী যূতি গোত্র এবং সাবেতকে দোয়া দ্বারা ধন্য করেন।[৮৯] হযরত আলীর দোয়ার বরকতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আবূ হানিফার মত মহৎ এক সন্তান দান করেছেন। হযরত আলীর সাথে ঈমাম আবূ হানিফার দারা যূতির ভালো সম্পর্ক ছিল। পারস্য নববর্ষ নওরোজের দিন তিনি একবার হযরত আলীকে ফালুদা পেশ করলে হযরত আলী বলেন,

نَوْرُوْزُنَا كُلَّ يَوْمٍ.

৮৪. যাইদ আবুল হাসান ফারুকী : সওয়ানেখে বে-বাহায়ে ইমামে আযম, লাহোর, ১৯৯২ ইং, পৃষ্ঠা : ৫৭
৮৫. আওজাযুল মাসালিক, ১/৬০
৮৬. মুসলিম শরীফ, ২/৩১০
৮৭. তিরমিযী শরীফ, পৃষ্ঠা : ২৪৮
৮৮. মুসলিম শরীফ, ২/৪২৪
৮৯. তারিখে বাগদাদ, মিশর ১৯৩১ ইং, ১৩/৩২৬

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

'প্রত্যেক দিনই আমাদের জন্য নতুন দিবস।'[৯০]

ইমাম আবূ হানীফা (৮০ হি.) যখন কুফায় জন্মগ্রহণ করেন, তখন আব্দুল মালেক বিল মারওয়ান (৮৬ হি./৭০৫ ইং) ক্ষমতাসীন ছিলেন। তাঁর রাজত্বের পরিধি পূর্ব পশ্চিম এবং উত্তর ও দক্ষিণে হেজায ইরাক থেকে শুরু করে সিরিয়া, এশিয়া মাইনর তুর্কিস্থান ইরান, আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের মুলতান নগরী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ওয়ালীদের আমলে ইমাম আবূ হানীফা টগবগে যুবক ছিলেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (৭৫ হি./৭১৩ ইং) ইরাকের গভর্ণর ছিলেন। ১৫০ হিজরী শাওয়াল মাসে জুমার দিন তিনি কুফায় ইন্তিকাল করেন। তখন খলীফা মনসুরের শাসনকাল ছিল। ইমাম আবূ হানীফা আসেমের তাজবীদ অনুসারে ইলমে ক্বেরাত শিখেন। ৮৬ হি.-৮৮ হি. এবং ৮৮ হি.-৮৯ হি. সময়কালে আরবী গ্রামার ও সাহিত্য এবং কবিতার ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। যুক্তি বিজ্ঞানে তিনি এতো সুনাম অর্জন করেন, যাতে সকলের দৃষ্টিতে তিনি স্থান করে নেন।[৯১]

৯৫-৯৮ হি. সময়কালে তর্ক বিদ্যায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ৯৯-১০৩ হি. সময়কালে হাদীসের দরসগুলোতে অংশগ্রহণ শুরু করেন। ১০৪-১২০ হি. এ সময়কালে ইজতিহাদী ফিক্বহ চর্চার লক্ষ্যে হযরত হাম্মাদের শিষ্যত্ব দ্বারা ধন্য হন।

খলীফা আবূ জাফর মনসুরের ১৫৮ হি./৭৭৬ সালে প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি বলেছিলেন, আমি হযরত উমর আলী, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের ইলম অর্জন করেছি।[৯২]

যখন থেকে তিনি ইলম চর্চার নিমিত্তে মনোনিবেশ করলেন তখন এতো পরিমাণ ইলম অর্জন করলেন, যা তার সময়কালে অন্যরা অর্জন করতে পারেনি।[৯৩]

ইমাম আবূ হানীফার শিক্ষকগণের মধ্যে সাহাবা এবং বড় বড় তাবেয়ীগণ ছিলেন। সাহাবাদের মধ্যে হযরত আনাস, আব্দুল্লাহ বিন হারেস, আব্দুল্লাহ বিন সাওফা প্রমুখ ছিলেন। ইমাম আবূ হানীফা হযরত উমর ও

৯০. মুহাম্মদ আলী : ইমামে আযম আওর ইলমে হাদিস, সিয়ালকুট, পৃষ্ঠা : ১৪৬, আল-খায়রাতুল হেসানের উদ্বৃতি দিয়ে, ২/৪৫৪
৯১. মানাকেবে কর্দরী, পৃষ্ঠা : ৬৪, তারিখে বাগদাদ, ১৩/২৩২
৯২. মুহাম্মদ আলী সিদ্দীকি : ইমামে আযম আওর ইলমে হাদিস, লাহোর, ১৯৮১ ইং, তারিখে বাগদাদের উদ্বৃতি দিয়ে।
৯৩. কিতাবুল আনসাব, পৃষ্ঠা : ১৫৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার ৯৬ হিজরী এবং তার পরবর্তী সময়ে ফয়েজ অর্জন করেন।[৯৪] তাবেয়ীগণের মধ্যে ইমাম শা'বী (১০৪ হি./৭২২ ইং) থেকে ফয়েজ লাভ করেন। যিনি প্রায় ৫০০ সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন।[৯৫] ইলমে হাদীসের মধ্যে তাঁর কোন দ্বিতীয় বিকল্প ছিলনা। তাঁর একটি উক্তিতে হাদীস এবং ফিকহের পার্থক্য পরিষ্কার হয়ে যায়। তিনি (শা'বী) বলেন, আমরা ফকীহ নয়। আমরা তো হাদীস শুনে শুনে ফকীহদের সামনে পেশ করে থাকি।[৯৬]

ইমাম আবূ হানিফার শিক্ষকগণের মধ্যে ইমাম হাম্মাদ (১২০ হি./৭৩৭ ইং) সাহাবী হযরত আনাসের শিষ্য ছিলেন। ইমাম আবূ হানিফা বর্ণিত চার হাজার হাদীসের মধ্যে শুধু হাম্মাদ থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ছিল দু'হাজার। আবূ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন হাসান বিন হাসান (১৪৫ হি./৭৬২)ও তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে ছিলেন।[৯৭] ইমামের সকল উস্তাদগণ খাইরুল কুরুনের সময়ের ছিলেন। এমনিতো তার শিক্ষকমণ্ডলীর সংখ্যা তো অনেক। মোল্লা আলী ক্বারীর (৭৩২ হি./১০১৪ ইং) মতে, এ সংখ্যা চার হাজার তবে বিশেষ উস্তাদগণের সংখ্যা ছিল ৭৪ জন।[৯৮]

যেহেতু ইমাম হাম্মাদ (১৭৪ হি./৭৯০-৯১ ইং) ইমাম আবূ হানিফার মানষে এই কথা বসিয়ে দিয়েছিলেন যে, একজন ফকীহর ইজতেহাদী যোগ্যতা হাদীসের জ্ঞান সম্পন্ন করা ছাড়া সম্ভব নয়। সেই জন্য ইমাম আবূ হানিফা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে হাদীসের জ্ঞান সম্পন্ন করেছেন এবং হাদীসের একটি বড় অংশ সংকলন করেছেন। তিনি নিজেই বলেন, 'আমার কাছে হাদীসের সিন্ধুক ভরা রয়েছে, কিন্তু আমি সেখান থেকে খুব অল্প হাদীসই বের করেছি। যেগুলোর দ্বারা মানুষ লাভবান হতে পারে।'[৯৯] তিনি যে হাদীসগুলো পেশ করেছেন, সেই ব্যাপারে ইমাম বুখারীর উস্তাদ আলী বিন জা'দ যওহরী মন্তব্য করেন, 'ইমাম আবূ হানীফা যখনই হাদীস পেশ করেন তখন সেটা মুক্তার মত উজ্জ্বল হয়ে ফুটে।'[১০০]

৯৪. ইশারাতুল মুরাম, পৃষ্ঠা : ২০, যুহরা, পৃষ্ঠা : ২৭৫
৯৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফা ১/৭৯
৯৬. তাযকিরাতুল হুফ্ফা ১/৭৯
৯৭. আবু যুহরা : হায়াতে হযরত ইমামে আযম, পৃষ্ঠা : ১৭০
৯৮. শরহে মুসনদে আহমদ, পৃষ্ঠা : ২০
৯৯. মানাকিবুল মুওফিক, ২/৯৫
১০০. জামেউল মাসানিদ, ২/৩০৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইমাম আবূ হানীফা ইলমে হাদীসের বিশেষজ্ঞ এবং মুজাতাহিদ ছিলেন। সাতেভির (৭৯০ হি./১৩৮৮ ইং) মতে, ইজতেহাদের যোগ্যতা কেবল ঐ ব্যক্তির অর্জন হয়, যার মধ্যে দুটি গুণ রয়েছে-

১. যে পুরো শরিয়তের মাকাসেদ (গুঢ় রহ্যসা ও উদ্দেশ্যাবলী) বুঝতে সক্ষম।
২. যিনি মাসয়ালা বের করার সামর্থ রাখেন।[১০১]

ইমাম আবূ হানীফার মধ্যে এই শক্তিটি পরিপূর্ণরূপে ছিল। আর এই প্রতিভা তার অর্জন হয়েছে হাদীস শিখার মাধ্যমে। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই কেয়াস এবং যুক্তির পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন।

এক ব্যক্তি এসে আরজ করলেন যে, আমার বোন হজ্বের মান্নত করার পর মারা গিয়েছে। তার পক্ষ থেকে কি হজ্ব করা যাবে। তখন হুযূর বললেন, তার উপর যদি ঋণ থাকত তাহলে সেগুলোকে তোমরা আদায় করতে। ঐ লোকটা আরজ করলো, জি হ্যাঁ। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তাহলে এইখানেও এভাবে আল্লাহর হককে আদায় করতে হবে।[১০২] হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষনাৎ নির্দেশ না দিয়ে কিয়াসের সূত্র ব্যবহার করে হুকুম জারি করেছেন। ইনসাইক্লোপিডিয়া অফ ইসলামের প্রবন্ধকার লিখেন, ইমাম আবূ হানীফা ৯০ হাজারেরও বেশী মাসায়েল সম্পাদনা করেছেন।[১০৩]

ইমাম আবূ হানীফা সত্যবাদিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁর উপর কোনভাবেই মিথ্যার অপবাদ দেয়া যেতে পারে না।[১০৪] যখন দুনিয়াবী বিষয়সমূহের তার বিরুদ্ধে মিথ্যার অপবাদ দেওয়া যায় না, তাহলে দ্বীনি বিষয়সমূহে তিনি মিথ্যায় পতিত হবেন এমনটা ভাবা সঠিক বিবেক-বুদ্ধির পরিপন্থি ব্যাপার।

ইমাম আবূ হানীফা মদীনায় হযরত বাকেরের (১১৪হি:/ ৭৩২ইং) সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি আবূ হানীফার কপালে চুমু দিয়েছেন। আবূ হানীফা একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত তাঁর খেদমতে ছিলেন। তাঁর সাহেবজাদা হযরত জাফর সাদেক রাদিয়াল্লাহু আনহু (১৪৮ হি./৭৬৫ ইং) থেকেও ফয়েজ অর্জন করেছেন। তাঁরা প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। এমনিভাবে ইমাম আবূ হানীফা নববী

[১০১]. শাতবী : আল-মওফিকাত, ১/২৪
[১০২]. মনসুর আলী : ফতহুল মুবিন, পৃষ্ঠা : ২৮, বুখারী ও মুসলিমের উদ্বৃতি দিয়ে।
[১০৩]. দায়েরা মা'রিয়ে ইসলামিয়া
[১০৪]. কিতাবুল এস্তেগনা, পৃষ্ঠা : ৫৭৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পরিবার থেকে ফয়েজপ্রাপ্ত হলেন। ইমাম আবূ হানীফা ১৬/২০ জন সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। যাঁদের মধ্যে হযরত আনাস বিন মালেক, হযরত সাহল বিন সা'দ এবং হযরত আবূ তুফায়েল আমের বিন ওয়াসেলা, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আওফা রাদিয়াল্লাহু আনহুম অন্যতম ছিলেন।

হারাম শরীফে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ বিন হারেসের (৯৬ হি./৭১৪ ইং) হাদীসের দরসে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে এই হাদীস শুনেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনকে সম্পূর্ণরূপে বুঝবে এবং সেই রূপে আমল করবে, তখন আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট এবং তার জন্য এমন স্থান থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করবেন যা সে কল্পনা করবেনা।'[১০৫]

বিখ্যাত হাদীস- "طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَي كُلِّ مُسْلِمٍ" (প্রত্যেক মুসলমানের ওপর জ্ঞানার্জন করা ফরয) ইমাম আবূ হানীফা হযরত আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে সরাসরি বর্ণনা করেছেন।[১০৬] ইমাম আবূ হানীফা হাদীসের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। সেই সময় পর্যন্ত পৃথক সংকলনগুলো ছাড়াও ছাহাবা এবং তাবেয়ীনদেরও হাদীসসমূহ মৌখিকভাবে মুখস্থ ছিল।

ইমাম আবূ হানীফা বিপুলভাবে মুহাদ্দীসীনগণের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন, যাদের মধ্যে কিছু সাহাবীও ছিলেন। আর বেশীর ভাগ ছিলেন তাবেয়ীন। কুফা ছাড়া তিনি বসরায় হযরত কাতাদাহ থেকে হাদীস অর্জন করেছেন। যিনি হযরত আনাস থেকে হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। বসরাও হযরত উমর ফারুক আবাদ করেছিলেন। এই নগরটিও ইলমের প্রচার ও হাদীসের প্রসারের ক্ষেত্রে কুফার সমকক্ষ ছিলো।

ইমাম আবূ হানীফা তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলোকে 'কিতাবুল আসার' নামে সংকলন করেছেন। কিন্তু ইমাম মালেক বিন আনাসের এই বৈশিষ্ট্য অর্জিত ছিল যে তিনি হাদীসের প্রথম সুশৃংখল ও গঠনমূলক একটি সংকলন 'মুয়াত্তা' নামে সংকলন করেছিলেন। তারপর তাঁর ছাত্র ইবনে শিহাব জুহুরী সনদ সহকারে নিয়মতান্ত্রিকভাবে হাদীস সংকলনের বুনিয়াদ রাখেন। এরপর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইবনে মাজাহ, ইমাম তিরমিযী প্রমুখ হাদীসের কিতাবসমূহ সংকলন করেন। কিন্তু কুরআন-সুন্নাহর মাসায়েল

[১০৫]. মুসনাদে ইমামে আযম, লাহোর, পৃষ্ঠা : ৩৬
[১০৬]. জালালুদ্দিন সুয়ূতী : তাবয়িদুস সহীফা, সাঈদীর উদ্বৃতি দিয়ে, পৃষ্ঠা : ৬-৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সম্পাদনা এবং অধ্যায় সহকারে নিয়মিতভাবে ইলমে শরীয়তের সম্পাদনের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফার উপর কেউ অগ্রগামী হতে পারে নাই।[১০৭] ইমাম আবূ হানীফা মদীনা এবং মক্কায় গিয়ে হাদীস অর্জন করেছেন। মক্কার বিখ্যাত তাবেয়ী আতা বিন আবী রাবাহ (১১৫ হি./৭৩৩ ইং) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (৬৮ হি./৬৮৭ ইং) শিষ্য ইকরামা (১০৫ হি./৭২৩ ইং) থেকে হাদীস অর্জন করেছেন। যিনি হযরত আলী, হযরত আবূ হুরায়রা, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন।

উমাইয়া সাম্রাজ্যের শেষ সময়কালে নির্যাতনের কারণে ইমাম আবূ হানীফা মক্কায় রওনা দেন এবং সেখানে ১৩০ হি./৭৪৭ ইং থেকে ১৩৬ হি./৭৫৩ ইং সময়কাল পর্যন্ত বসবাস করেন।[১০৮]

মক্কায় বসবাস করার সময় মুহাদ্দীস ইয়াসীন যিয়াত ঘোষণা করেন, যে ইমাম আবূ হানীফা কাছে আসা যাওয়া কর। কেননা এমন লোক তোমরা আর পাবে না। এই ব্যক্তিকে তোমরা হারিয়ে ফেললে ইলমের একটি বড় অংশ নষ্ট হয়ে যাবে।[১০৯]

আব্দুল্লাহ বিন মোবারক (১৮১হি./৭৯৭ই) কা'বার হেরেমে মানুষদের ভীড়ে এবং মুহাদ্দীস ও ফকীহগণের মাঝখানে ইমাম আবূ হানীফাকে ফতোওয়া প্রদানে দেখেছেন।[১১০] মক্কায় তার বিশ্রামগারে আস্‌সাহাবে সুফ্‌ফা হাদীস চর্চাকারীদের ভীড় লেগে থাকতো।[১১১] ইমাম লাইছ (১৪৩ হি./৭৬০ ইং) মক্কায় উপস্থিত হয়ে দেখেন যে, ইমাম আবূ হানীফার সাক্ষাতে মানুষ ভেঙ্গে পড়তেছিল।[১১২] ইমাম আবূ হানীফা তাবেয়ীনদের মধ্যে থেকে ছিলেন।[১১৩] ইবনে সা'দ (২৩০ হি./৮৪৪ ইং) তাকে তাবয়ীনদের পঞ্চম স্তরে গণ্য করেছেন।[১১৪] মদীনায় হযরত মায়মুনার (৫১ হি./৬৭১ ইং) খাদেম সোলায়মান এবং হযরত উমরের নাতি হযরত সালেম বিন আব্দুল্লাহ (১০৬ হি./ ৭২৪ ইং) থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। ইমাম ইমাম আবূ হানীফ ৪০০০ হাজার ব্যক্তি

[১০৭]. জালালুদ্দিন সুয়ূতী : তাবয়িদুস সহীফা আলা মানাকিবিল ইমাম আযম আবু হানিফা, ইবনে মাজাহ'র উদ্বৃতি দিয়ে, আবদুল রশিদ নোমানী, পৃষ্ঠা : ১৫৮-১৬১

[১০৮]. আবু যুহরা : হায়াতে ইমাম আবু হানিফা (উর্দূ অনুবাদ হারিরী) ফায়সালাবাদ ১৯৮০ ইং, পৃষ্ঠা : ৬৭

[১০৯]. সাদরুল আয়িম্মা, ১/৩৮

[১১০]. সাদরুল আয়িম্মা, ১/৫৭

[১১১]. মুকাদ্দামা ই'লাউস্ সুনান, পৃষ্ঠা : ৭২

[১১২]. যাহাবী : মানাকিবে আবু হানিফা, পৃষ্ঠা : ২২

[১১৩]. ইবনে নাদীম, পৃষ্ঠা : ২০

[১১৪]. দায়েরা মা'য়িফে ইসলামিয়া, পৃষ্ঠা : ৭৮৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছে। ইমাম আবূ হানীফা অধিকাংশ শিক্ষক ছিলেন তাবেয়ীন। ইমাম আবূ হানীফা অসংখ্য মুহাদ্দেস থেকে হাদীসের ভাণ্ডার সংগ্রহ করে একত্রিত করেছিলেন এবং তার উপর ফিকাহর ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। ঐ যামানায় বই ও লেখা-লেখী এত ব্যাপক ছিল না। যা থেকে অনুমান করে যেতে পারে যে, হাদীস সংকলনে তিনি কি পরিমাণ কষ্ট সহ্য করেছেন এবং কি পরিমাণ পরিশ্রম করেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা হাদীসের দিকে এই জন্য দৃষ্টি দিয়েছেন, যেহেতু কুরআনের হুকুম মতে হাদীস হচ্ছে ফেকাহর বুনিয়াদ। হাদীস কুরআনের অনুগামী এবং কুরআনের জ্ঞানও আমরা হাদীসের মাধ্যমে পেয়েছি। অন্যথায় কুরআনকে চিনার অন্য কোন মাধ্যম নেই। হাদীস অস্বীকার করা মানে কুরআনকে অস্বীকার করা। কোন মুসলমান থেকে এমন ধৃষ্টতা আশা করা যায় না।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহ্যিক জীবনের সাহাবারা তার কাছে মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করতেন। তিনি উত্তর দিতেন। এইভাবে অন্যান্য সাহাবীরা বিশেষ সাহাবাগণের নিকট জিজ্ঞাসা করতেন। যখন ধীরে ধীরে তারা দুনিয়া থেকে চলে যেতে লাগলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তার বিশেষ অনুগ্রহে ইমাম আবূ হানীফাকে পাঠালেন, যার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে পূর্ব থেকেই ভবিষ্যৎ বাণী করেছিল। তিনি বিক্ষিপ্ত হাদীসগুলোকে একত্রিত করেছেন। ছড়িয়ে ছিড়িয়ে থাকা মতামতগুলোকে সংকলন করেছেন এবং নিজেই কুরআন হাদীস এবং সাহাবাগণের ইজমার আলোকে হাজার হাজার মতামত প্রদান করেছেন। এই মতামতগুলোকে অস্বীকার করা এবং নিজের মনগড়া আমল করা দুনিয়ার সপ্তাচর্য থেকে একটি। আমরা তো এতই অপরাগ যে, শিক্ষা কারীকুলাম প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও, সহজলভ্য হওয়া সত্ত্বেও উস্তাদ ও নির্দেশকের প্রয়োজন পড়ে। আর যখন কারীকুলামই থাকবেনা তখন আমাদের উদ্বেগের কারণটা কতো বড় হতে পারে?

ইমাম আবূ হানীফা নিজেই পরিশ্রম করেছেন আমাদেরকে পেরেশানী থেকে মুক্তি দিয়েছেন। ইজহাদের মূলনীতি প্রণয়ন করেছেন। অতঃপর সেগুলোর আলোকে মাসয়ালা সমূহের সমাধান খুঁজে বের করেছেন। যেমন-

❖ প্রথমে কিতাবুল্লাহ থেকে মাসয়ালার সমাধান অনুসন্ধান করা; সফল হলে ফয়সালা দেওয়া হতো। আর সফল না হলে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

- ❖ রাসুলের হাদীস থেকে মাসয়ালার সমাধান খুঁজা। সফল হলে ফয়সালা দেওয়া হতো।[১১৫]
- ❖ হাদীসে না থাকলে ফতোওয়ার যোগ্য সাহাবা এবং ফকীহ তাবেয়ীনগণের মতামত দেখা হতো। সেখানে সমাধান পাওয়া গেলে সেভাবে ফয়সালা দেওয়া হতো।[১১৬]
- ❖ সেই ক্ষেত্রে সফল হওয়া না গেলে তখন নবী, সাহাবী, তাবেয়ী যুগসমূহের নানা ফয়সলার আলোকে কেয়াস করা হতো। এবং সেই মতে সিদ্ধান্ত দেওয়া হতো।
- ❖ 'ইসতিহসান' (সুক্ষ্ম কেয়াস), তার মূল তাৎপর্য হলো- ফেকহী অন্তরদৃষ্টি।
- ❖ 'ওরফ' অর্থাৎ সেই প্রচলন যার দিকে আল্লাহর বান্দাগণ প্রকৃতগতভাবেই ঝুকে থাকতেন।

মোটকথা, উপরিউক্ত মূলনীতিগুলো থেকে পরবর্তী সমস্ত মুজতাহীদগণ উপকৃত হয়েছেন। যেমন- ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইমাম শাফেয়ী তো বলেই ফেলেছেন যে, সমস্ত ফকীহগণ আবূ হানীফার সন্তান তুল্য।[১১৭]

এই কর্ম-পদ্ধতিটি আবূ হানীফার নিজস্ব মনগড়া নয়; বরং ঐ পবিত্র হাদীস দ্বারা তার সমর্থন পাওয়া যায়। যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুয়াজ বিন যাবলকে ইয়ামেনের গভর্নর বানিয়ে প্রেরণ করতেছিলেন। তখন জিজ্ঞেস করলেন, যখন তোমার সামনে কোনো মুকাদ্দামা পেশ হবে, তখন তুমি কিভাবে রায় প্রদান করবে। হযরত মুয়ায বললেন, আল্লাহর কিতাব দ্বারা ফয়সালা দিবো। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি সেখানে না পাও তাহলে? মুয়ায উত্তর করলেন, রাসূলের হাদীস দ্বারা। অতঃপর যদি সেখানে না পাও? মুয়ায আরজ করলেন, আমি নিজেই চিন্তা করে ইজতেহাদ করবো এবং হাকীকত পর্যন্ত পৌঁছার ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি করবো না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাঁর বক্ষে হাত মেরে

[১১৫]. হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানী বলেন, আশ্চর্য বিষয় হলো যে, ইমাম আবু হানিফা সুন্নতের অনুকরণে সবচেয়ে অগ্রগামী এমন কি রাসূলের হাদীসকে মুসনাদে হাদীসের মত অনুকরণের উপযুক্ত মনে করেন। এবং নিজের মতামতের উপর সেটাকে প্রাধান্য দেন। এবং নবীর সুহবতের কারণে সাহাবাদের মতামতকেও নিজের যুক্তির উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। অন্যরা এমন নয়। (শেখ আহমদ শেরহিন্দী)

[১১৬]. স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা বলেন, যখন কোন মাসয়ালা কিতাবুল্লাহ ও রাসূলের হাদিসে না পাই, তখন আমি সাহাবাদের উক্তি দেখি। সাহাবাদের উক্তির সামনে কারো মতামতকে গ্রহণযোগ্য মনে করিনা। (ইবনে আবদিল বর : আল-ইন্তিকা, ছাহবী মাহমাসানী : ফালসাফাতুস তাশরীহ ফিল ইসলাম, পৃষ্ঠা : ৩৮

[১১৭]. মুআত্তা ইমাম মালেক, মুকাদ্দমা সাঈদী, পৃষ্ঠা : ৩৪-৩৫

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বললেন, আল্লাহর কৃতজ্ঞতা যে, যিনি রাসূলুল্লাহর প্রেরিত ব্যক্তিকে এমন বিষয়ে তৌফিক দান করেছেন, যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে আনন্দিত করে।[১১৮]

এ হাদীসকে খুবই স্মরণ রাখা উচিৎ। এই হাদীস মতে রায় প্রদানের ক্ষেত্রে প্রথমে কুরআনের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। অতঃপর হাদীসের দিকে। এরপরও যদি ফয়সালা দেওয়া না যায় তাহলে কুরআন-হাদীসের আলোকে ইজতেহাদ করতে হবে। ইজতেহাদ করা শিশুদের খেলা নয়। তার জন্য বড় অনুধাবন, চিন্তা এবং অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে।

আমাদের যুগে এমন সব সমস্যা দৃশ্যমান যা সুস্পষ্টভাবে কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ নেই এবং না সাহাবাদের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। যদি কিয়াসকে অস্বীকার করা হয় তাহলে আধুনিক সমস্যাবলির সমাধানের কি অবস্থা হবে? আমাদের উলামা নিত্যনতুন সমস্যার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে ফতোয়া দিয়ে যাচ্ছেন। আর সবাই সেটা গ্রহণ করে যাচ্ছেন। কেউতো এটা বলছেন যে, যেহেতু কুরআন-হাদীসে নেই, তাহলে আপনারা কেন কিয়াস করছেন। কিয়াস ব্যতীত আধুনিক মাসয়ালা সমূহের সমাধান অসম্ভব। সেই জন্যই ইমাম আবূ হানীফা অসমাধানযোগ্য মাসয়ালা সমূহের কুরআন-হাদীসের আলোকে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। যা হাদীস দ্বারা সমর্থিত। যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন ব্যক্তিকে কিয়াসের অনুমতি প্রদান করেছেন। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা তার জন্য একটি বোর্ড তৈরী করে ফেলেছেন। যেখানে মুহাদ্দিসগণ ছিলেন, ফকীহবিদরা ছিলেন এবং সাহিত্য ও ভাষার পণ্ডিতরাও ছিলেন। যা বিস্তারিত সামনে আলোচনা করা হবে।

মোটকথা ইমাম আবূ হানীফা কিয়াসের জন্য অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও সতর্কতার সাথে কাজ করেছেন। অতঃপর কুরআন-হাদীসের ছড়িয়ে থাকা অন্যান্য আদেশ ও নিষেধাবলীকে সুশৃংখলভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি এ কৃতিত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। আহকাম সমূহকে সুশৃংখল প্রক্রিয়ার মধ্যে এনে আমাদের জন্য অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছেন। আমরা অধিকাংশ সময় সংসদ সদস্য এবং সাধারণ জনগণকে এই সমালোচনা করতে শুনি যে, আইন প্রণয়ন না করে অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়। ইমাম আবূ হানীফা আইন প্রণয়ন করেছেন। অর্ডিন্যান্স প্রয়োগ করেন নি। আমরা এই সংকটগুলোকে বাস্তব ময়দানে পরীক্ষা করেছি। আমাদের আইন প্রণয়নকারীরা

[১১৮]. সুনানে আবু দাউদ, লাহোর, পারা : ২৩, পৃষ্ঠা : ৮৭, হাদিস : ১৯৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হলেন তারা যাদের সাথে কুরআন-হাদীসের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। তাদের সম্পর্ক কেবল মনপ্রবৃত্তির সাথে, হয়তো ব্যক্তি বিশেষের চাহিদা কিংবা কিছু লোকের মনপ্রবৃত্তির চাহিদার উপর তৈরী হওয়া আইন ভাংগা গড়ায় চলমান থাকে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা এমন আইন প্রণয়ন করেছেন যা খোদায়ী ওহীর উপর দণ্ডায়মান। যে সম্বন্ধে কবি ইকবাল বলেন,

خوب وناخوب عمل کی ہو گرواکیوں کر؟ گر حیات آپ نہ ہو شارح اسرار حیات

ইমাম আবূ হানীফা জীবন রহস্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং হানাফী ফিকাহর মাধ্যমে এক মহা আইন উৎসর্গ করে গেছেন।

ড. বশির আহমদ সিদ্দিকীর ভাষায় হানাফী ফিকাহর নিয়মিত সম্পাদনার মুকুট ইমাম আযম এর মাথায় শোভা পায়।[১১৯]

শরীয়তের পরিভাষায় ফিকাহর এই সংজ্ঞা দেওয়া হয় যে, ফিকাহ শরীয়তের ঐ সকল আহকামকে বলা হয়, যা বিস্তারিত দলিলের মাধ্যমে অর্জন করা হয়।[১২০]

ফিকাহর চার উৎস : (১) কুরআন (২) হাদীস (৩) ইজমা (৪) কিয়াস। অর্থাৎ কোন সম্মিলিত কারণের ভিত্তিতে অন্য বিষয়গুলোতেও একই বিধান চালু করা। ফিকাহ সম্পাদনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বাস্তব জীবনে রাসূলুল্লাহ এবং শরীয়তের ভিক্ষিপ্ত মাসআলাগুলোকে শৃংখলিত করা এবং তার এমন চূড়ান্ত অবস্থান নির্দিষ্ট করে দেওয়া যার উপর মুসলমানরা অত্যন্ত সহজভাবে যথাযথ রূপে আমল করতে সক্ষম হয়।

এইগুলো এমন সব মাসআলা ছিলনা যা ঐ জমানায় সৃষ্টি হয়েছিলো; বরং এমন সকল মাসয়ালার সমাধান প্রস্তাব করা হয়। যা আগামীতে সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা নিজেই বলেছেন, আহলে ইলমদের উচিৎ যে সব বিষয়ে মানুষদের পতিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলোর উপর চিন্তা ভাবনা করা। যেন ঐসব বিষয়গুলো কোন এক সময় দেখা দিলে তা যেন মানুষদের কাছে নতুন এবং আর্শ্চয বোধক মনে না হয়।[১২১]

ইমাম আবূ হানীফা এই মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি বোর্ড প্রণয়ন করেছেন, যেখানে ৪০জন বিশেষ আলেম শরীক ছিলেন। তাঁদের অন্যতম

[১১৯]. মাহনামা নূর ইসলাম : ইমাম আবু হানিফা, পৃষ্ঠা : ১৬৮
[১২০]. আলা উদ্দিন হাসকফী : আদ দুররুল মুখতার শরহে তানভিরুল আবছার, হাশিয়া রদ্দুল মুহতার, ১/২৭-২৮, কুয়াইটা থেকে প্রকাশিত।
[১২১]. আল-মওফিক মকাকী : মানাকিবে ইমামা আবু হানিফা, দক্ষিণ হায়দরাবাদ, ১/১৬০

ছিলেন আবূ ইউসুফ, জোফর, আসাদ বিন আমর, আফিয়া আল ওরদি, কাসেম বিন মা'আন, আলি বিন মুসহের, মেহের বিন আলী, মন্দল বিন আলী।[১২২]

আবূ হানীফার পদ্ধতিটা ছিল এমন যে তিনি পরামর্শের জন্য বিষয়গুলোকে সদ্যস্যদের সামনে রাখতেন। আলোচনা-পর্যালোচনা চলতো, কখনো সেই আলোচনা-পর্যালোচনায় এক মাস বা তার চেয়ে বেশী সময় অতিবাহিত হয়ে পড়ত। যখন সম্মিলিতভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো তখন আবূ ইউসুফ সেগুলোকে উসূলের মধ্যে লিখে ফেলতেন। এইভাবে 'উসূল' সম্পাদিত হয়।

ইমাম আবূ হানীফা কখনো নিজের মতামতকে অন্যের উপরে চাপিয়ে দেন নি। তিনি চূড়ান্ত পর্যায়ে সতর্কতার সাথে কাজ নিয়েছেন[১২৩] এবং হাদীসের মুকাবেলায় না নিজের এবং না অন্য কারো মতামতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বরং এই সম্ভাবনাকে সামনে রেখে যে ১৫০ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালে ইসলাম দূরদুরান্ত ছড়িয়ে পড়েছে। এবং পরিবহনের মাধ্যম ছিল খুবই সীমিত। সম্ভাবনা ছিল যে, কোন সাহাবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি কথা শুনে অনেক দুরবর্তী অঞ্চল চলে গেছেন। এবং সেই কথা তার পর্যন্ত পৌঁছেনি। আর তাই তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, যদি বোর্ডের সিদ্ধান্তের বিপরীত কোন সহীহ হাদীস পাওয় যায় তখন সেটাই আমল করা হবে। এবং সেটাই আমার মাজহাব বলে ধর্তব্য হবে।[১২৪]

এইটা সকলেই জ্ঞাত যে ইসলাম ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করেছে। যে বস্তু পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি লাভ করে নানা অবস্থায় তার রূপ ভিন্ন হতে চলে। এই জন্য একই আমলের ব্যাপারে একাদিক হাদীস পাওয়া যায় এবং যেখানে আমরা বৈপরিত দেখতে পায় এমনি অবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা সেই হাদীসকে গ্রহণ করতেন যা মহানবীর শেষ আমলের দিকে ইঙ্গিত বহন করত। এইটা ছিল ফয়সালার সর্বোত্তম পদ্ধতি। এই বিষয়টিকে একটি উদাহরণের মাধ্যমে স্পষ্ট করা যেতে পারে।

বাগানওয়ালা আমের কলম লাগিয়েছে। সেই কলম একজন দেখে চলেগেলেন। তারপর সেই কলম ফুটলো। পাতা এবং শাখা-প্রশাখা তার বের হলো। তৃতীয় ব্যক্তি এটা দেখি চলে গেলেন। অতঃপর ঐ গাছে নেমে আসল

[১২২]. তারিখে বাগদাদ, ২২/১০৮
[১২৩]. মওফিক বিন আহমদ মকাকী : মানাকিবে মওফিক, ২/১৩৩
[১২৪]. আহমদ রেযা খান : আল-ফাযলুল মওহবী এবং আল-মিযানুল কুবরা, মিশর, পৃষ্ঠা : ৭৫৮

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বৈল। চতুর্থ ব্যক্তি এইটা দেখে চলে গেল। অতঃপর গাছে ক্ষীর দেখা দিল, পঞ্চম ব্যক্তি তা দেখে চলে গেল। তারপর এই ক্ষীরগুলো তাদের যৌবন দেখাতে শুরু করল। ষষ্ঠ ব্যক্তি তা দেখে চলে গেল। এইসব লোক একই গাছকে বিভিন্ন সময় দেখেছেন। প্রথম ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হল আমের গাছ কিরকম? উত্তরে সে বলল গাছের একটি টুকরা, দ্বিতীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হলো সে বলল, গাছের এমন টুকরো যেখানে পাতা এবং শাখা-প্রশাখা বের হওয়া ছিল। তৃতীয় ব্যক্তি বললো, এইটা এক বিশাল বৃক্ষ। চতুর্থ ব্যক্তি উত্তরে বলল, এটা এমন বিশাল বৃক্ষ যেখানে বৈল ফুটেছে। পঞ্চম ব্যক্তি প্রতি উত্তরে বলল, এত বড় একটি বৃক্ষের মধ্যে ক্ষীর বের হয়েছে। ষষ্ঠ ব্যক্তি প্রতি উত্তরে বলল, এত বড় বৃক্ষ বড় বড় আম দ্বারা ভরপুর হয়ে থাকে।

লক্ষ্য করুন সবার বক্তব্য আলাদা আলাদা, কিন্তু সবাই সত্যবাদী কেউ মিথুক নন, কিন্তু সবচেয়ে সত্য হল ঐ ব্যক্তির কথা যে আম দ্বারা ভরপুর গাছকে দেখেছে। এরপর যদি কেউ এই কথার উপর পীড়াপীড়ি করে যে না তার কথাই সত্য যে বলেছেন আমগাছ গাছের টুকরোর মতো হয়। তার কথাও একপ্রকার সত্য। কিন্তু এইগুলো ধারাবাহিক স্তরসমূহ। এটা প্রাথমিক স্তরের কথা। এই কথা মেনে নেওয়া যায় না। তবে শুনা যেতে পারে, যাতে জানা যায় যে গাছ কোত্থেকে কোথায় পৌঁছেছে। ইমাম আবূ হানীফা ঐ সকল হাদীসের উপর মতামত দিয়েছেন, যেগুলো দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ কাজটি প্রমাণিত হয়। গাছের মত মহানবীর কথা ও কাজ ধীরে ধীরে বিকশিত হয়, মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ কাজটি হল সর্বাধিক সত্য। এই কথাটি আরো একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝা যেতে পারে।

যেমন ধরুন, নামাযে হাত উঠানোর বিষয়টি। অর্থাৎ নামাযের মধ্যে রুকুতে যাওয়ার সময়, রুকু থেকে উঠার সময়, সিজদায় যাওয়ার সময়, সিজদা থেকে উঠার সময়, কিয়াম ও কা'দা করার সময় দুই হাত কাঁধ অথবা কান পর্যন্ত নিয়ে আবার ছেড়ে দেওয়া। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন হেকমতের কারণে কখনো এই রকম 'রফয়ে ইয়াদাইন' (হাত উত্তোলন) করেছিলেন। তারপর ছেড়ে দিয়েছেন, এখন সর্বশেষ আমলটি ছিল 'রফয়ে ইয়াদাইন' ছেড়ে দেওয়া। তাই এইটার উপর আমল করা চাই। হাত উঠা-নামা যদি নামাযের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতো তাহলে অবশ্যই তা কুরআনে উল্লেখ হতো। কুরআনে কিয়াম, রুকু, সিজদা, কা'দার কথা উল্লেখ রয়েছে। হাত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উঠা-নামার কথা কোথায় আসেনি। এ থেকে জ্ঞানি ব্যক্তি শরীয়তের মনোভাব বুঝে নিতে পারে।

"রফেইয়াদাইন" ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে অনেকগুলো হাদীস রয়েছে।[১২৫] মোটকথা, ইমাম আবূ হানীফা বোর্ডের মাধ্যমে ৮৩ হাজার মসয়ালা প্রণয়ন করেছেন, যার মধ্যে ৩৮ হাজার ১০২টির সম্পর্ক ইবাদতের সাথে। বাকী মাসয়ালাসমূহ লেনদেন ও দণ্ডবিধি সংশ্লিষ্ট। প্রায় ২২ বৎসরের এক নাগাড়ে রাতদিন প্রচেষ্টা ও প্রয়াসের পর ইমাম আবূ হানীফার পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত ফিকাহ প্রস্তুত হয়ে ইলম পিপাসুদের হাতে পৌঁছে। এই সংকলনটি ১১৪ হিজরির পূর্বে প্রস্তুত হয়েছিল। এরপর তাতে আরো সংযোজন হয়, এইটায় হল হানীফি ফিকাহ। এই সংকলনটি সম্পূর্ণ হওয়ার পর কুফার জামে মসজিদে ১০০০ হাজার ছাত্র এবং বোর্ডের সদস্যদের সামনে তিনি একটি ভাষণ দেন। যেইখানে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো ছিল এই রকম।

- ❖ আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কসম এবং তাঁর ইলমের দোহায় দিয়ে বলতে চাই এই কাজকে যেন কোনভাবে অপমান না করা হয়।
- ❖ বিচারকের দায়িত্ব ঐ সময় গ্রহণযোগ্য যখন বিচারকের যাহের এবং বাতেন এক হবে। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিচারকের দায়িত্বভার নিবে সে নিজের এবং জনগণের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি না করে।
- ❖ প্রত্যেক অভাবি ব্যক্তি পর্যন্ত তোমাদের পৌঁছতে হবে।
- ❖ বাদশাহ এবং রাজা যদি আল্লাহর বান্দাদের সাথে অন্যায় আচরণ করে তাহলে তাকেও যেন জিজ্ঞেসা বাদ করা হয়।[১২৬]

এই নির্দেশনাগুলো বড় প্রাণবন্ত ছিল। তার পিছনে নিষ্ঠার সমুদ্র তরঙ্গায়িত ছিল, তিনি যা বলেছেন তা করে দেখিয়াছেন। খলিফা মনছুর (১৫৮ হি./

---

[১২৫]. দেখুন : ১. তিরমিযী শরীফ : ১/৩৫, ২. ইবনে হাযম যাহেরী : আল-মহল্লী, ৪/৮৮, ৩. আবু দাউদ শরীফ : ১/১২৫, নাসায়ী শরীফ : ১/১৫৮, আবু দাউদ শরীফ : ১/১০৯, আবু দাউদ শরীফ : ১/১২৬, শরহে মা'নিল আসার, ১/১১০, উমদাতুল ক্বারী : ৫/২৭২, মুসলিম শরীফ : ১/১৮১, মুসলিম শরীফের একটি বর্ণনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রফয়ে ইয়াদাইনকে زنـاب خيل شمس (অর্থাৎ ঘোড়ার লেজের নড়াচড়ার সাথে উপমা দিয়েছেন) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, أسـكنوا في الصلاة (নামাজে স্থির থাকো) অর্থাৎ এদিক ওদিক হেলিওনা। ঘোড়ার লেজের মত হাত হেলাওনা। (নসবুর রায়া, ১/৪০৪)
আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রফয়েইয়াদাইন করেছেন আমরাও করেছি। আর যখন তা ছেড়ে দিয়েছেন, তখন আমরাও ছেড়ে দিয়েছি। (বাদায়ে;, ১/২০৭) কেমন হৃদয়গ্রাহী উসূল।

[১২৬]. মু'জামুল মুসান্নিফীন, ২/৫৫

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৭৭৪ইং) শরীয়তের আড়ালে নিজের প্রবৃত্তি রচনা করার জন্য ইমাম আবূ হানীফাকে বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দিতে চাইছিলেন। তিনি তার অসৎ উদ্দেশ্য অনুমান করে ফেলেছিলেন এবং প্রস্তাবটি প্রত্যাখান করেন। অতঃপর তিনি গ্রেফতার হলেন (১৪৭ হি./৭৬৩ ইং)[১২৭] খলিফার নিয়তের অবস্থা সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই বন্দীদশায় (১৫০ হি./৭৬৭ ইং) শাহাদত বরণ করেন। কিন্তু শরীয়তের উপর আছড় দিতে দেন নাই। সুবহানাল্লাহ!

ইমাম আবূ হানীফাকে আল্লাহ পাক নজীরবিহীন এমন প্রজ্ঞা দান করেছেন যার উল্লেখ হাদীস শরীফে রয়েছে।[১২৮] হাদীসে সত্যিই বলা হয়েছে, 'দুই জিনিস ব্যতীত অন্য কিছুতেই ঈর্ষা নেই। সেই দুই বিষয়ের একটি হল আল্লাহ পাক কোন ব্যক্তিকে এমন প্রজ্ঞা দান করেছেন যা দ্বারা সেই ফয়সালা প্রদান করেন এবং মানুষকে সে প্রজ্ঞা শিক্ষা দান করেন।'[১২৯] নিশ্চয় এমন কৃতিত্বপূর্ণ মজবুত মানুষেরই অধিকার হল কুরআন-হাদীস থেকে বিধানসমূহ আবিস্কার করে আনা, যা কোন মূল্যে ক্রয় করে আনা যায় না। এবং যে ব্যক্তি আবার সত্যের সংরক্ষণে নিজের জান দিতে প্রস্তুত। এইগুলো সব ঐতিহাসিক বাস্তবতা, যা সর্বদা আমাদের দৃষ্টিগোচর থাকা চাই।

ইমাম আবূ হানীফা জীবনের ৫২টি বছর উমাইয়া খেলাফত এবং ১৮বছর আব্বাসী খেলাফত যুগে কাটিয়েছেন। ইসলামের দু'টি মহা রাজত্ব স্বচক্ষে দেখেছেন কিন্তু রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেননি। যেটাকে সত্য জেনেছেন তা সমর্থ করেছেন। অনেক সময় রাজনৈতিক মানসিকতা পোষণকারী শাসকবর্গ এমন সব ইনসাফপূর্ণ মতামতের উপর রাজনীতির রং ছড়িয়ে দিয়ে আহলে হকের ব্যাপারে কুধারণা পুষণ করে বসত। আর সম্ভবত এই কারণে তদানিন্তন সময়ে খলিফা তার উপর অসন্তুষ্ট ছিল এবং তাঁকে গ্রেফতার করেন। কবি বলেন,

ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق — یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق

হাজারও ভয়ের মাঝে হৃদয়ের বন্ধু থাকবে মুখ, পৃথিবীর শুরু থেকেই এইটাই ছিল ফকিরদের রীতি।

১২৭. ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম, পৃষ্ঠা : ৭৮৩
১২৮. বুখারী শরীফ, লাহোর, ১৯৯৯, খন্ড : ২, অধ্যায় : ৩৭, পৃষ্ঠা : ৭৯৭
১২৯. বুখারী শরীফ, পৃষ্ঠা : ৭৯৭

ইমাম জুহুরীর (১৩০ হি./৭৪৭ ইং) মতে, ইমাম আবূ হানীফা কুফার জামে মসজিদের সেই প্রসিদ্ধ ইলমী মসনদে সমাসীন হয়েছেন যেটি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (২০ হি.) এর যুগ থেকে নিয়মিত চলে আসছিল। তিনি ফিকাহ অধ্যায়গুলোর উপর বিশেষ আলোচনার করেছেন, যেগুলাকে তাঁর শিষ্যরা কিতাবুল আছার নামে সংকলন করেছেন। এইটি দ্বিতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয় এক চতুর্থাংশ সময়কালের রচনা। ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম আবূ ইউছুফ, ইমাম জুহর, ইমাম হাসান বিন জিয়াদ চারটি আলাদা আলাদা সংকলনকে এই নামে প্রস্তুত করেছেন। এইখানে ৪০ হাজার হাদীস নির্বাচন করা হয়।[১৩০]

'কাশফুজ জুনুন' নামক গ্রন্থে এ কিতাবগুলোকে ইমাম হানীফার বলে উল্লেখ করা হয়।

১. কিতাবুল ইলমি ওয়াল মুতাআল্লিয়ন।[১৩১]
২. কিতাবু আল ফিকহিল আক্ববর।[১৩২]
৩. কিতাবুল ওয়াসায়া।

তাযকিরাতুল মুহাদ্দেসীনে (সাঈদী) কিতাবুল মকসুদ এবং কিতাবুল আওসাদকেও ইমাম আবূ হানীফার বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৩৩]

ইমাম আজম আবূ হানীফা দরসের সময় যে সকল হাদীস বর্ণনা করতেন, তার শাগরেদগণ বিশেষত কাজী আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ বিন হাসান শায়বানী, জুফর বিন হুজাইল এবং হাসান বিন জিয়াদ প্রমুখ ঐ বর্ণনাগুলোকে حدثنا এবং أخبرنا শব্দদ্বারা লিপিবদ্ধ করতেন।

হযরত ইমাম আযম হাদীস লেখানোর পরে এই সংকলনকে কিতাবুল আছার নাম দিয়েছেন। ছাত্র যেহেতু বেশী ছিল সেই জন্য এই সংকলনটি একই নামে কয়েকটি ছিল। যার মধ্যে চারটি ছিল খুব প্রসিদ্ধঃ
(১) কিতাবুল আছার (আবূ ইউসুফের বর্ণনা), (২) কিতাবুল আছার (হাসান বিন জিয়াদের বর্ণনা), (৩) কিতাবুল আছার (মুহাম্মদের বর্ণনা), (৪) কিতাবুল আছার (জুফর বিন হুযাইলের বর্ণনা)।

তবে সবচেয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করে ইমাম মুহাম্মদেরটি। কিতাবুল আছারে ইমাম আযম যে সকল শায়খগণ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, পরবর্তীতে

১৩০. যুহুরী : পৃষ্ঠা : ৩৬৩
১৩১. কাশফুয যুনূন, ২/১৪৩
১৩২. কাশফুয যুনূন, ২/১২৮
১৩৩. গোলাম রাসূল সাঈদী : তাযকেরাতুল মুহাদ্দেসীন, পৃষ্ঠা : ৬৫

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অনেকেই প্রত্যেক শায়ইখের বর্ণনাসমূহকে পৃথক আকারে মুসনদরূপে সংকলন করেছেন এবং প্রত্যেক শায়খের বর্ণনাসমূহকে আলাদা আলাদা কিতাবে একত্রিত করেছেন। পরে যা 'মুসনদে ইমাম আযম' নামে প্রসিদ্ধ হয়। ইসলামী বিশ্বকোষে তার আরেকটি বই 'আর রাদ্দু আলাল কাদারীয়া' নামে সন্ধান পাওয়া যায়।

আবূ হানীফার শিষ্যবৃন্দ

১. তাঁর এক হাজার শিষ্য ছিলেন যার মধ্যে ৪০জন উচ্চস্তরের মুজতাহিদ ছিলেন।

২. ইমামের ছাত্রদের সংখ্যা ৪ হাজার, যার মধ্যে ৪০ জন গ্রন্থপ্রণেতা ছিলেন।[১৩৪]

যে সকল শিষ্যগণ হানাফী ফিকাহ লিখেছেন

এক. কাজী আবূ ইউসুফ। ইবনে নদীম 'আল-ফিহরাস্তে' আবূ ইউসুফের ১৪টি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন।

দুই. ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান। তিনি আবূ হানীফার কাছে পড়েছেন এবং আবূ ইউসুফের নিকট কোর্স পূর্ণাঙ্গ করেছেন।

উস্তাদ আবূ যুহরা ইমাম মুহাম্মদের ঐ সমস্ত কিতাবগুলো উল্লেখ করেছেন। আল-মাবসুত, জিয়াদাত, আল-জামেউস ছগীর, আল-জামেউল কবির, আল-সিয়ারুল কবির, আল-সিয়ারুল সাগীর।

তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ ছিলেন কালোত্তীর্ণ। তাঁদেরকে শায়খাইন বলা হয়। হানেফী ফিকহের প্রচার-প্রসারের তাঁরা উভয়ে ব্যপক অবদান রেখেছেন।

৩. জুফর বিন হুজাইল, ইবনে নদীম ফিকহে হানীফের মধ্যে তাঁর ৯টি কিতাব উল্লেখ করেছেন।

৪. দাউদ আত তা'ঈ (১৫৬ হি./ ৭৮১ ইং)।

৫. আসাদ বিন উমর (১৬০ হি./৮২০ ইং)।

সম্ভবত ঐ সব শাগরদদের মধ্যে তাবেয়ীনও ছিলেন।

নিম্মোক্ত উলামাগণ ফিকহে হানেফীকে মুখে ও কলমে প্রচার করেছেন :

১. ঈসা ইবনে আয়ান (২২০ হি. /৮৩৫ ইং) রচিত বইয়ের সংখ্যা ৫।

[১৩৪]. আল-জাওয়াহিরুল মজিয়াহ, ১/১৪০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২. মুহাম্মদ বিন সামা'আ (২২৩ হি./৮৩৭-৮ ইং) রচিত বইয়ের সংখ্যা ৩।

৩. বেলাল বিন ইয়াহইয়া বিন বসরী (২৪৫ হি./৮৫৯ ইং) রচিত বইয়ের সংখ্যা ৩।

৪. আহমদ বিন উমর বিন মেহের (২৬১ হি./৮৭৪-৭৫ ইং) রচিত বইয়ের সংখ্যা ১৩।

৫. আহমদ বিন মুহাম্মদ (৩২১ হি./৯৩২ ইং) রচিত বইয়ের সংখ্যা ১২।

হিদায়াতুল আরেফীনে নিম্নের কিতাবগুলোকে ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসানের রচিত বই হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

১. আল ইহতেজাজ আলা-মালেক।
২. আল-ইকতেসাব ফির রিযক।
৩. আকাঈদ আশ-শাইবানিয়া।
৪. কিতাবুল আসল ফিল ফুরু।
৫. কিতাবুল ইকরাহ।
৬. কিতাবুল হিয়াল।
৭. কিতাবুল সুহবাত।
৮. কিতাবুল শুরোত।
৯. কিতাবুল কাসাব।
১০. কিতাবুল নাওয়াদির।
১১. আল কায়সানিয়াত।
১২. মানাসিকুল হজ্ব।
১৩. নওয়াদিরুসসিয়াম।
১৪. আল-হারুনিয়াত।[১৩৫]

ইমাম আবূ হানীফা কুরআন-হাদীসের আলোকে

কুরআন করীম গায়েবী সংবাদে ভরা। কাহিনীর সংবাদ, ব্যক্তিবর্গের খবর, অতীতের ঘটনা, ভবিষ্যতের বিষয়সমূহ। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে নিজের প্রিয় নবীকেও গায়েবের ইলম দ্বারা ধন্য করেছেন।[১৩৬] হাদীস শরীফেও

[১৩৫]. হিদয়াতুল আরেফীন, ১/৮
[১৩৬]. আল-কুরআন, সূরা জুমা, আয়াত : ২-৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

গায়েবের সংবাদ দ্বারা ভরপুর।[১৩৭] হযরত আবূ হুরাইরা বলেন, আমরা নবীর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম তখনই সূরাতুল জুমা অবতীর্ণ হলো।

هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا۟ بِهِمْ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٣﴾

"তিনি যিনি অশিক্ষিতদের মাঝে তাদের মধ্যে থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যেন সেই তাদের কাছে আল্লাহর নিদর্শনগুলো পড়ে শোনাই, তাদেরকে পবিত্র করে, তাদেরকে কিতাব এবং হিকমত শিক্ষা দান করে। নিশ্চয় তারা ইতিপূর্বে প্রকাশ্য ভ্রষ্টতার মধ্যে ছিল। এবং তাদের মধ্যে থেকে অন্যদেরকেও (পবিত্র করবেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন) যারা পূর্বদের মধ্যে ছিলেন না এবং তিনি সম্মানি ও প্রজ্ঞার অধিকারী।"[১৩৮]

হযরত আবূ হুরায়রা আয়াতগুলো শুনেছেন, কিন্তু এই কথা বুঝতে পারেন নি যে, ভবিষ্যতের ঐ সকল লোক কারা যাদেরকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র করবেন এবং ইলম ও হিকমত দান করবেন। যারা এখনো তাঁর সাথে সাক্ষাতের সোভাগ্য অর্জন করেন নি। এটা কিসের দিকে ইংগিত? মনে মনে তিনি বিষয়টি ভাবছিলেন। অবশেষে মহানবীর খেদমতে আরজ করলেন, হুযূর! তারা কারা? ব্যাপারটি গোপনীয় ছিল। তাই হুযূর তার জবাব ইরশাদ করেননি। হযরত আবূ হুরায়রা পুনঃরায় ইরশাদ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা কারা? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিয়ে চুপ রইলেন। হযরত আবূ হুরাইয়রা আবার প্রশ্ন করলেন, তারা কারা হে নবী?[১৩৯]

তৃতীয়বার প্রশ্নের পরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যতের সেই পর্দা উঠিয়ে দিলেন এবং গোপন রহস্যটি ফাঁস করে দিলেন। হযরত সালমান ফারেসী (৩৩ হি./৬৫৩ ইং অথবা ৫৩ হি./৬৭২ ইং) পিছনে বসা ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত মোবারক সালমান ফারেসীর

[১৩৭]. আহমদ বিন মুহাম্মদ সিদ্দিকী আল গেমারী আল হাসানী : ইসলাম আওর আসরী ইজাদাত (উর্দূ অনুবাদ আহমদ মিয়া বরকতী) লাহোর থেকে প্রকাশিত, ১৯৮০ ইং।

[১৩৮]. আল-কুরআন, সূরা জুমা, আয়াত : ২-৩

[১৩৯]. বুখারী শরীফ, ২/৯৭৩, হাদিস : ৮৮৯, লাহোর থেকে প্রকাশিত

www.AmarIslam.com

কাধে রেখে বললেন,[১৪০] 'যদি ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রের কাছে হয়, তবুও এদের মধ্যে থেকে কিছু লোক অথবা একজন লোক সেখান থেকে ঈমান অর্জন করে নিবে।'[১৪১]

এরা সেই সব লোক বা ব্যক্তি বিশেষ যারা পূর্বদের অন্তর্গত ছিলেন না। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইলম ও হিকমত দান করেছেন এবং পবিত্র করেছেন।

এইটি পরিস্কার সুসংবাদ, এখানে কোনো লুকানোর কিছু নেই। হযরত সালমান ফারেসীর মত হযরত ইমাম আবূ হানীফা পারস্যবাসী ছিলেন।[১৪২] যে সালমান ফারেসীকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পরিবারের সদস্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[১৪৩] ইমাম আবূ হানীফার পূর্ব পুরুষ ছিল পারস্যের। তাঁর পরদাদার নাম ছিল মির্জাবান এবং হযরত সালমানের দাদার নাম ছিল শাখসান। হতে পারে তাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিলো। তবে এতটুকু তো অবশ্যই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিকমতের অধিকারী সে ব্যক্তির জন্য এই ভবিষ্যত বাণী করেছেন যে, সে পরাসী অঞ্চলের হবে।

বুখারী শরীফ ছাড়াও মুসলিম শরীফে একটি হাদীস পাওয়া যায় যে, যদি ঈমান সুরাইয়াতে অবস্থান করে তাহলে পারস্যের সন্তানদের মধ্যে একজন ঐ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এবং তা অর্জন করে নিবে।[১৪৪]

হযরত আবূ হুরাইরা বারংবার প্রশ্ন করা সত্ত্বেও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুপ থাকা এই কথার দিকে ইঙ্গিত করে যে, তিনি আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলেন।

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

[১৪০]. মুহাম্মদ আলী আস সাবুনী : সাফওয়াতুত তাফাসীর, ১৮/৫১, বৈরুত, লেবানন

[১৪১]. ১. বুখারী শরীফ, হাদিস : ৮৮৯, ২. তাবয়িদুস সহীফা, পৃষ্ঠা : ৫, ৩. আল-খায়রাতুল হেসান, পৃষ্ঠা : ১৪-১৫, ৪. আদ দুররুল মনসূর, ৬/২১৫, ৫. তাফসীরে খাযেন, ৪/২৬৪, তাফসীরে মাযহারী, ৯/২৭৫, রুহুল মা'আনী, ১০/৮৩, তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৪/৩৬৩, তাফসীরে ইবনে জারীর, ১২/৬২

[১৪২]. আত তা'লিকাত আলাল মানাকিব, পৃষ্ঠা : ৮, যুহরীর উদ্বৃতি দিয়ে, পৃষ্ঠা : ১২১

[১৪৩]. যাইদ আবুল হাসান ফারুকী : সওয়ানেখে বেবাহায়ে ইমামে আযম আবু হানিফা, লাহোর ১৯৯২, পৃষ্ঠা : ৫৭, সুয়ূতীর জামে; সগীরের উদ্বৃদি দিয়ে।

[১৪৪]. মুসলিম শরীফ, পৃষ্ঠা : ৫৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"তিনি কোন কথা নিজের ইচ্ছায় ব্যাক্ত করেন না, এইটাতো নিশ্চয় ওহী ছাড়া কিছুই নয় যা তাকে দান করা হয়।"[১৪৫]

যখন আল্লাহর নির্দেশ হলো তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেইটা বলেছিলেন এবং কুরআনের আয়াতের রহস্য থেকে পর্দা সরিয়ে দিলেন। একথাও জানা গেলো যে, ইমাম আবূ হানিফা হুযূরের ফয়েজপ্রাপ্ত তাঁকে হুযূর পবিত্র করেছেন। তাঁকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলম ও হিকমত দান করেছেন। কুরআন এটাই বলছেন এবং সত্য বলছেন। অন্যান্য হাদীসেও ইমাম আবূ হানীফার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[১৪৬]

জালালুদ্দীন সুয়ূতী এই হাদীস সম্পর্কে বলেন,

هَذَا أَصْلٌ صَحِيْحٌ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فِي الْبِشَارَةِ بِأَبِي حَنِيْفَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ.

'এইটি নিয়ম অনুযায়ী সহীহ, যার ভিত্তিতে এই কথা বিশ্বাস করা যায় যে এখানে আবূ হানীফার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।'[১৪৭]

শাহ ওয়ালীউল্লাহ রাহমতুল্লাহি আলাইহি এই হাদীস থেকে ইমাম আবূ হানীফাকে বুঝিয়েছেন।[১৪৮]

নিঃসন্দেহে ইমাম আবূ হানীফাই এই হাদীসের উদ্দেশ্য এবং কুরআন মতে তিনি মহানবীর ফয়েজপ্রাপ্ত। সুতরাং যারাই ইমাম আবূ হানীফার ইলম ও হিকমত থেকে ফয়েজপ্রাপ্ত হবে নিঃসন্দেহে তাঁরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও ফয়েজ লাভের সক্ষম হবে। আর এই ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। এমনকি যখন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তাশরীফ আনবেন তখন তিনি এই সত্য ধর্মের অনুসারী হবেন,[১৪৯] যা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসিলায় আমরা পেয়েছি এবং যার উপর হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম চলেছেন।[১৫০] যার উপর স্বয়ং দু'জাহানের সর্দার চলেছেন।[১৫১] যার উপর ইমাম আবূ হানীফা চলেছেন। যার উপর

১৪৫. আল-কুরআন, সূরা নাজম, আয়াত : ৩-৪

১৪৬. ১. মিশকাত শরীফ, কিতাবুল মানাকিব, باب جامع المناقب পৃষ্ঠা : ২৭১, হাদিস : ১৭, ২. আল-খায়রাতুল হেসান, তয় মুকাদ্দামা, পৃষ্ঠা : ৫১

১৪৭. আল-খায়রাতুল হেসান, পৃষ্ঠা : ১৪-১৫

১৪৮. শাহ ওয়ালি উল্লাহ : মাকতুবাত শরীফ, পৃষ্ঠা : ১৬

১৪৯. শেখ আহমদ সারহিন্দি : মাকতুবাত শরীফ, খন্ড : ২, মাকতুব নং : ১৭

১৫০. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৯০, ৬৭, সূরা নিসা, আয়াত : ১২৫, সূরা নাহল, আয়াত : ১২৩

১৫১. আল-কুরআন, সূরা নাহল, আয়াত : ১২৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উম্মতের বুযর্গ ব্যক্তিরা চলেছেন এবং আমিও আপনি চলছি এবং এই সিলসিলা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। ইনশাআল্লাহ।

হযরত আবূ হুরায়রা হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি (৬ হি.) এবং খায়বার যুদ্ধ (৭ হি.) এর মাঝামাঝি সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এই জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ভবিষ্যত বাণী ৬ এবং ৭ হিজরির মাঝে করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা এই ভবিষ্যতবাণীর প্রায় ৭৩ বছর পর ৮০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম আবূ হানীফার জন্ম ইলমে শরীয়তের সম্পাদনা এবং বিশ্বজোড়া তাঁর কেন্দ্রিয় অবস্থান। দুনিয়ার মহান ঘটনাগুলোর একটি।

এই জন্য ইমাম তাহাবী (৩২১ হি./৯৩২ ইং) মতে,

أَبَا حَنِيْفَةَ اَلنُّعْمَانَ مِنْ أَعْظَمِ الْمُعْجِزَاتِ بَعْدَ الْقُرْآنِ.

'কুরআনের পরে ইমাম আবূ হানীফা সবচেয়ে বড় মু'জিযা।'[১৫২]

ইবনে হাজার হায়তমী (৯৭৫ হি./ ১৫৮-৬ ইং) এই হাদীসের উপর আলোচনা করে বলেন, এখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুস্পষ্ট মু'জিযা রয়েছে। তিনি আগামীর কথা বলে দিয়েছেন।[১৫৩]

ইসলামের ইতিহাস এবং বিশ্ব ধর্মসমূহের ইতিহাসের উপর যাদের দৃষ্টি রয়ে গেছে তারা এইটাকে এড়িয়ে যেতে পারেন না। ইমাম আবূ হানীফার এই গৌরবও অর্জন রয়েছে যে, তিনি কিছু সাহাবা থেকে সরাসরি হাদীস শ্রবণ করেছেন। যেমন- বিখ্যাত হাদীস-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

"ইলম শিক্ষা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।"

হাদিসটি ইমাম আবূ হানীফা রাসূলের সাহাবী হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ হানীফার শান আব্দুল্লাহ বিন মুবারকের মত বড় মুহাদ্দেসের এই কথা থেকেও অনুমান করা যেতে পারে।[১৫৪]

لَقَدْ زَانَ الْبِلَادَ وَمَنْ عَلَيْهَا إِمَامُ الْمُسْلِمِيْنَ أَبُو حَنِيْفَةَ.

১৫২. আদ দুররুল মুখতার, পৃষ্ঠা : ৪৫, দিল্লি

১৫৩. মুহাম্মদ আলী সিদ্দিকী : ইমামে আযম আওর ইলমে হাদিস, লাহোর ১৯১১, পৃষ্ঠা : ১২৯, খায়রাতুল হেসানের উদ্বৃতি দিয়ে, পৃষ্ঠা : ৬

১৫৪. সুয়ূতী : তাবয়িদুস সহীফা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

'যে ইমাম আবূ হানীফা শহরগুলোকে আলোকিত করেছেন এবং শহরবাসীকে ইহসান করেছেন।'[১৫৫]

আব্দুল ওহাব শা'রানী (৯৭৩ হি./১৫৬৫ ইং) 'মিযানুস্ শরিয়া' গ্রন্থে লিখেছেন-

وَقَدْ مَنَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ بِمُطَالَعَةِ مَسَانِيْدِ الإِمَامِ أَبِي حَنِيْفَةَ النُّلاَثَةَ.

'আল্লাহ আমাকে ইমাম আবূ হানিফার তিনটি মুসনাদ অধ্যয়ন করার তৌফিক দিয়েছেন।'[১৫৬]

পূর্ব ও পরবর্তী মনীষীগণের দৃষ্টিতে ইমাম আবূ হানীফা

ইমাম আবূ হানীফার ব্যাপারে তাঁর সমকালীন ওলামাগণ, সহপাঠি এবং নিকটবর্তী সময়ের বিশিষ্ট জন ও পরবর্তী সময়কালের ওলামা-মাশায়েখ এবং বিজ্ঞ আলেমগণ উত্তম মতামত পেশ করেছেন। তাঁদের মতামতের আলোকেও ইমাম আবূ হানীফার মর্যাদা ও অবস্থান নির্ধারণ করা যেতে পারে। যেমন-

হযরত ইমাম মালেক বলেন, আল্লাহর কসম আমি তার মত কাউকে দেখিনি।[১৫৭]

ইমাম শাফেয়ী বলেন, সমস্ত লোক ফিকাহর ক্ষেত্রে আবূ হানীফার মুখাপেক্ষী।[১৫৮]

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেন, আবূ হানীফা বুযর্গী তাকওয়া এবং আখেরাত অর্জনের ক্ষেত্রে এমন অবস্থানে উপবিষ্ট ছিলেন, যা অন্য কারো ছিল না।[১৫৯]

তাঁর সহপাঠি ওলামাগণ বলেন, আমরা আবূ হানীফার সাথে ইলমে হাদীস অর্জন করেছি তিনি আমাদের সবার মধ্যে অগ্রগামী ছিলেন। তাপস্য অর্জন করেছেন সেখানেও তিনি এগিয়ে গেলেন। তার সাথে আমরা ফিকাহ অর্জন করতে গেলাম, সেখানেও তিনি যে ভূমিকা লিখেছেন তাতো তোমাদের সামনে।[১৬০]

১৫৫. আবদুল কাইয়ুম হক্কানী : দেফায়ে' ইমাম আবু হানিফা, লাহোর ১৪০৭ হি., পৃষ্ঠা : ৩৯, আখবারে আবু হানিফা আজমিরীর উদ্বৃদি দিয়ে।
১৫৬. আবদুল ওয়াহহাব শা'রানী : মিযানুস শরীয়াহ আল কুবরা, ১/৬৮
১৫৭. আয যরকলী : আল-আ'লাম, ৯/৫
১৫৮. প্রাগুক্ত
১৫৯. প্রাগুক্ত
১৬০. সমশুদ্দীন যাহাবী : মানাকিবে আবু হানিফা, মিশর, পৃষ্ঠা : ২৭

ইমাম আবূ হানীফার ছাত্র ইমাম আবূ ইউসুফ বাদশাহ হারুন রশিদের জিজ্ঞাসার জবাবে ইমাম আবূ হানীফার এই মহত্ত্ব তুলে ধরেন: তিনি অত্যন্ত পরহেজগার ছিলেন, অন্যায় থেকে বিরত থাকতেন, কারো কাছে নিজের প্রয়োজন নিয়ে যেতেন না, দুনিয়াওয়ালাদের কাছ থেকে বেচে থাকতেন। পার্থিব মর্যাদা ও সম্মানকে তুচ্ছ জ্ঞান করতেন, পরনিন্দার ব্যাপারে অনেক শতর্ক ছিলেন। সম্পদের ন্যায় ইলম খরচ করার ক্ষেত্রেও বড় উদার ছিলেন। বেশীর ভাগ সময় চুপ থাকতেন এবং চিন্তা করতেন, কেউ মসয়ালা জিজ্ঞাস করলে যদি জানতেন তাহলে উত্তর প্রদান করতেন, অন্যথায় চুপ থাকতেন।[১৬১]

এই সব মহত্ত্ব ও গুণাবলী বর্তমানে ওলামাদের মধ্যে খুবই দুষ্প্রাপ্য। ইমাম আবূ হানীফার এই চরিত্রগুলো তাঁর সন্তানদের মধ্যে পাওয়া যায়। তাঁর নাতি ইসমাঈল বিন হাম্মাদকে বাদশাহ মামুনুর রশিদ বিচারপতির দায়িত্ব নিয়োগ করেছিলেন। যখন দায়িত্ব পালিন শেষে বসরা থেকে চলে যাওয়ার সময় তাঁকে বিদায় জানানোর জন্য পুরো নগর উপচে পড়েছিল। এইটি ছিল তাঁর চরিত ও কৃতিত্বের কারামত। বর্তমানে কোন বিচারপতি অবসরে গেলে তখন মানুষ স্বেচ্ছায় তাদেরকে এইভাবে বিদায় জানায় না।

নিকটবর্তী সময়কালের মুহাদ্দিসগণের মধ্যে ইমাম ওয়াকী (১৯৭ হি./৮১১ ইং) বলেন, হাদীসের ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা যে সতর্কতা অবলম্বন করতেন সেটা অন্য কারো ব্যাপারে আমি দেখিনি।[১৬২]

ইমাম ওয়াকিকে কেউ বলেছিলেন, আবূ হানীফা ভুল করেছেন। তখন প্রতিউত্তরে তিনি যা বলেছেন তা থেকে ইমাম আবূ হানীফার পূর্ণবিচক্ষণতা ও মেধার আন্দাজ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন, আবূ যর, আবূ ইউসুফ এর ন্যায় কিয়াস বিশেষজ্ঞ; ইয়াহইয়া বিন যায়েদা; হাফজ বিন গিয়াস হাব্বান এবং হুজুলের ন্যায় হাফেজুল হাদীস; কাসেম বিন মা'ন এর মত ভাষা ও আরবী সাহিত্য বিশেষজ্ঞ; আবূ দাউদ তাঈ ফুজায়েল বিন আইয়াজের ন্যায় পরহেজগার ব্যক্তিবর্গ যদি তার সাথে সহবাস্থান করেন, তাহলে তিনি কিভাবে ভুল করতে পারেন?[১৬৩]

১৬১. আবুল হাসান যাইদ ফারুকী : সওয়ানেখে বেবাহায়ে ইমামে আযম, লাহোর ১৯৯১, পৃষ্ঠা : ৭৬ (সংক্ষেপিত)
১৬২. মানাকিবে ইমামে আযম, ১/১৯৭
১৬৩. তারিখে বাগদাদ, ১৪/২৪

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উদ্দেশ্য ছিল, ইমাম আবূ হানীফা হাদীসের আলোকে একা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না। বরং তিনি হাদীসসমূহের উপর চিন্তা-গবেষণা এবং সেগুলোর বিধানসমূহ প্রণয়নের জন্য এমন দল গঠন করেছেন যেখানে হাদীস বিশেষজ্ঞও ছিলেন, ভাষা ও আরবী সাহিত্য বিশেষজ্ঞও ছিলেন। কিয়াস বিশেষজ্ঞও ছিলেন এবং যারা অতি পরহেজগার তারাও ছিলেন। বর্তমানে যারা তথাকথিত ইজতেহাদের দাবীদার তারা এই সমস্ত নেয়ামত থেকে বঞ্চিত। এই জাতীয় এজতেহাদের আবেগ থেকে শুধু দুর্গন্ধই আসে।

ইমাম আবূ হানীফার সমকালীন এবং তাঁর শিষ্য আব্দুল্লাহ বিন মুবারক বলেন, এটা বলিওনা যে অমুক বিষয়টি আবূ হানীফার নিজস্ব মতামত; বরং এমন বল যে, এটা হাদীসের ব্যাখ্যা।[১৬৪]

ইমা জুফর বিন হুজাইল বলেন, বড় বড় মুহাদ্দিস জাকারিয়া বিন আবূ জায়েদ (১৪৮ হি./৭৬৫ ইং) আব্দুল মালিক বিন আবূ সুলাইমান (১৪৫ হি./৭৫২ ইং) লাইস বিন আবী সুলাইম (১৪৩ হি./৭৬০ ইং) মতরফ বিন জরীফ (১৩৩ হি./৭৫১ ইং) হুসাইন বিন আব্দুর রহমানের মত ব্যক্তিরা হযরত আবূ হানীফার কাছে উপস্থিত হতেন এবং যে সব কঠিন মসয়ালা সামনে আসত অথবা কোনো হাদীসে সংশয় দেখা দিলে তখন তা আবূ হানীফার খেদমতে পেশ করতেন।[১৬৫]

ইয়াজিদ বিন হারুনের (২০৬ হি./৮২১ ইং) প্রতিক্রিয়া হল, আমি হাজার হাজার মুহাদ্দেসিনের শিষ্যত্ব লাভ করেছি। তাদের মধ্যে সবচেয়ে অভিজ্ঞ এবং বড় আলেম শুধু পাঁচজন ছিলেন। সেই পাঁচজনের মধ্যে আবূ হানীফার অবস্থান ছিল সর্বাগ্রে।[১৬৬]

এটি ছিল ইমাম আবূ হানীফার সমকালিন ব্যক্তিবর্গের প্রতিক্রিয়া। তাদের মুকাবেলায় একজন গবেষক ও ইতিহাসবিদের দৃষ্টিতে বর্তমানের বড় বড় জ্ঞানীদের মতামতেরও কোনো মূল্য নাই।

মুহাদ্দিস ইয়াজিদ বিন হারুন তাঁর দরসে আবূ হানীফার কথা শুনাতেন। এক ব্যক্তি বলল, আমাদেরকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনান। অন্য লোকদের কথা বাদ দেন। এটা শুনতে তিনি এই বলে ঐ

[১৬৪]. মোল্লা আলী ক্বারী : যাইলুল জওয়াহের, ২/৪৬০
[১৬৫]. মানাকিবে মওফিক, ২/১৪৮
[১৬৬]. জামেউল বয়ানে ওয়াল ইলমে/আল-ইন্তেকা, পৃষ্ঠা : ১৬৩

ব্যক্তিকে শাসিয়ে মজলিস থেকে বের করে দেন যে,[১৬৭] ইমাম আবূ হানীফার বক্তব্যসমূহ হাদীসের ব্যাখ্যা, যে ব্যক্তি তা শুনতে চায়না সেই আসলে হাদীসের রুচি রাখেনা। পরবর্তী সময়কালে ওলামা-মাশায়েখদের মধ্যে হযরত সৈয়দ আলী হাজুরী (৪৬৫ হি./১০৭১-২ ইং) হযরত বেলাল হাবশীর মাজারের নিকট স্বপ্ন দেখেছেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক এক বৃদ্ধকে কুলে উঠিয়ে রেখেছেন। জিজ্ঞাসা করা হলে স্বপ্নে মহানবী উত্তর করেন, ইনি তোমার এবং তোমার দেশবাসীর ইমাম আবূ হানীফা।[১৬৮] সৈয়দ আলী হাজুরী পারস্যের ছিলেন। এই স্বপ্নের উপর পর্যালোচনা করে তিনি বলেন, আমার স্বপ্ন সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কেননা, তিনি ঐ সকল মনীষীদের মধ্যে একজন, যিনি স্বীয় স্বভাবজাত গুণাবলীকে বিলীন করে দেন এবং আহকামে শরীয়তের উপর অটল থাকেন।[১৬৯]

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে হাজর মক্কী হাইসামী (৯৫৭ হি./১৫৬৭-৮ ইং) যার ইলমী বিশালতার ব্যাপারটি আহলে হাদীসের ব্যক্তিবর্গও স্বীকার করেন। তিনি ইমাম আবূ হানীফার ব্যাপারে তাঁর মত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, সবসময় হাজতগ্রস্ত ওলামা তাঁর কবর যিয়ারত করতেন। হাজত পুরণে তাঁকে উছিলা হিসেবে ধরতেন এবং সেইখানে তারা সফল হতেন। তাঁদের মধ্যে থেকে ইমাম শাফেয়ীও একজন। তিনি যখন বাগদাদ গেলেন তখন সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি ইমাম আবূ হানীফা থেকে বরকত অর্জন করে থাকি এবং তাঁর কবরে হাজীরা দিয়ে থাকি।[১৭০]

এই বড় মুহাদ্দিসের এসব বর্ণনা থেকে ইমাম আবূ হানীফার উঁচু মর্যাদার বিষয়টি অনুমান করা যেতে পারে। মৃত্যুর পরেও উলামাগণ কর্তৃক তার শরণাপন্ন হওয়ার ঘটনা এই বাস্তবতারই প্রমাণ যে তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়েজপ্রাপ্ত ছিলেন। এই জন্য তাঁর দিকে ওলামাদের অন্তরে একটা টান ছিল।

১০ম শতাব্দীর বিখ্যাত আলেম ও আরেফ হযরত শেখ আহমদ সরহিন্দি মুজাদ্দেদে আলফেসানি (১০৩৪ হি./১৬২৪ ইং) যার ব্যাপারে প্রাচ্যের দার্শনিক ইকবাল বলেছিলেন,

[১৬৭]. মানাকিবে মওফিক, ২/৪৮
[১৬৮]. আলী হেজুয়াইরী : কাশফুল মাহজুব, লাহোর, পৃষ্ঠা : ১০০-১০১
[১৬৯]. প্রাগুক্ত
[১৭০]. ইবনে হাজর মক্কী : আল-খায়রাতুল হেসান ফি মানাকিবিন নোমান, পৃষ্ঠা : ১৭৫

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وہ ہند میں سرمایۂ ملت کا نگہبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار

'হিন্দুস্তানে তিনি ছিলেন মুসলিম মিল্লাতের অমূল্য সম্পদের রক্ষক। যাকে আল্লাহ সময় মত করেছেন সচেতন।'

মিল্লাতে ইসলামিয়ার এই পাহারাদার ও রক্ষক ইমাম আবূ হানীফার ব্যাপারে বলেন, হযরত ইমাম আযমের উদাহরণ হযরত ঈসার ন্যায়, যিনি তাকওয়া ও বুযর্গের বরকতে এবং সুন্নাতের অনুসরণের দরুন ইজতেহাদের ক্ষেত্রে এমন উঁচু স্থান অর্জন করেছেন যা অন্যদের মেধা বুঝতে অক্ষম।[১৭১]

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (১১৭৬ হি./১৬৬২ ইং) বলেন, দু'জানের সর্দার হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই বোধ দান করেছেন যে, হানীফি মাযহাব একটি উত্তমপন্থা।[১৭২]

এই জন্যই শাহ ওয়ালি উল্লাহ বিশেষ অবস্থায় ইমাম হানীফার তাক্বলীদকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন এবং না করাকে হারাম বলে ফরমায়েছেন।

যখন হিন্দুস্তান (পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ ইত্যাদি) এবং মাওরাউন্নাহারের (তাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান ইত্যাদি) নগরসমূহে কোনো বে-ইলম ব্যক্তি থাকে এবং সেখানে কোনো শাফী, মালেকী, হাম্বলী আলেম না থাকে এবং তথায় মাজহাব সম্পর্কে কোনো বইয়ের অস্তিত্ব না থাকে, তখন এমনবস্থায় ইমাম আবূ হানীফার তাক্বলীদ ওয়াজিব। এবং তার জন্য এটা হারাম যে, ইমামের মাজহাবকে বাদ দিবে। কেননা এমনিভাবে সে শরীয়তের লাগাম গলা থেকে নামিয়ে ফেলে অকর্মন্য ও অপদার্থ হয়ে যাবে।[১৭৩]

ইবনে তাইমিয়া এবং ইবনে নুজাইম ইমাম শাফেয়ীর একথা বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি ফিকাহ শিখতে চাইবে তাকে আবূ হানীফার মুখাপেক্ষী হতে হবে।[১৭৪]

ভারতীয় উপমহাদেশে দেড়শতক বছর পূর্বে ৮০ভাগ মুসলমান সুন্নি হানীফি ছিল। কিন্তু যখন ইংরেজদের দখল দারিত্বে সুন্নিয়ত এবং হানফিয়তকে টার্গেট করা হয়, তখন মাওলানা আহমদ রেযা খান বেরলভী (১৩৪০ হি./১৯২১ ইং) শক্তভাবে তা মুকাবেলা করলেন এবং বাস্তবতার পক্ষে

[১৭১]. শেখ আহমদ সরহিন্দি : মাকতুবাত শরীফ, মাকতুব নং : ৫৫, পৃষ্ঠা : ২০০
[১৭২]. শাহ ওয়ালি উল্লাহ : আল-ইনসাফ, ইস্তামুল, পৃষ্ঠা : ২২
[১৭৩]. যাইদ আবুল হাসান ফারুকী : সওয়ানেখে বেবাহায়ে ইমামে আযম আবু হানিফা. পৃষ্ঠা : ২২
[১৭৪]. ইবনে নাজীম আল মিসরী : আল-আসবাহ ওয়ান নাযায়ের শরহে আসবাহের উদ্বৃতি দিয়ে, ১/২৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জোড়ালো ভূমিকা রাখেন। যার উপরে তাঁর বিখ্যাত রচনা ফতোয়ায়ে রেজভীয়া ১২খন্ডের পাক ভারত থেকে প্রকাশিত হয়। এই বাস্তবতাকে দেওবন্দ মসলকের প্রসিদ্ধ আলেম মাওলানা মুহাম্মদ জাকরিয়াও স্বীকার করেছেন। তিনি শায়খুল হাদীস আল্লামা মুহাম্মদ আমীর শাহ কাদেরীকে ফতোয়ায়ে রেজভীয়ার প্রথম পুরাতন প্রকাশিত কপি দিয়ে বলেন, যদি ভারতের আহমদ রেযা খান বেরলভী ফিকাহ হানীফির খেদমত না করতেন, তাহলে সম্ভবত হানফীয়ত অত্র এলাকায় নিঃশেষ হয়ে যেত। (লেখক : মুহাম্মদ মসউদ আহমদের নামে আল্লামা মুহাম্মদ আমীর শাহের চিঠি ২৬ সফর, ১৩৯৪ হি. পেশাওয়ার)।

মোটকথা কাজী আব্দুর রহমান বিন আলী হানাফী (৪৩৬ হি./১০৪৪ ইং) 'আখবারু আবূ হানীফা'তে, খতীবে বাগদাদ (৪৬২ হি./১০৬৯-৭০ ইং) তারিখে বাগদাদে, ইবনে খালকান (৬৮১ হি./১৩৮২ ইং) 'ওফায়াতুল আইয়ানে, ইবনে আব্দুল্লাহ (৪৬৩ হি./১০৭০ইং) 'কিতাবুল ইজতেগনা ওয়াল কুনা'য়, আল মুয়াফ্ফক বিন আহমদ মক্কী (৫৬৮ হি./১১৭২-৭৩ ইং) আল মানাকিবে, ইবনে কাইয়ুম যওজী (৭৫১ হি./১৩৫০ ইং) ইলামূল মুয়াক্কিইনে, জালালুদ্দীন সুয়ুতী (৯১১ হি./১৫০৫ ইং) তাবিজুস সহিফায়, মুহাম্মদ বিন ইউছুফ সালেমী (৯৪২ হি./১৫৫৩ ইং) উকুদুল জুম্মানে, ইবনে হাজর হাইসামী (৯৭৩ হি./১৫৬৫ ইং) আল-খায়রাতুল হিসানে, আব্দুল ওয়াহাব শা'রানী (৯৭৩ হি./১৫৫৬ ইং) আল মিজানুল কুবরায়, ইবনে খালদুন তাঁর মুকাদ্দমায়, মুহাম্মদ বিন হাসান আল দিয়ার বকরী তারিখুল খমিছে, ইউসুফ বিন তাগজি, আল-নুজুম আজ্জওহারে, আহমদ রেযা খান বেরলভী (১৩৪০ হি./১৯২১ ইং) ফতোওয়ায়ে রেজভীয়াতে এবং এছাড়াও অগণিত ওলামাগণ ইমাম আবূ হানীফার ব্যাপারে নিজেদের পর্যাপ্ত মতামত ব্যক্ত করেছেন। এই ছোট পুস্তিকায় যা উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

হানীফ শব্দের অর্থ হলো সোজা, ইসলামের বিধানের উপর চলতে ব্রতী হওয়া,[১৭৫] হকের দিকে ধাবমান, দ্বীনের ব্যাপারে সত্যবাদী, বাতিল থেকে হকের দিকে আগন্তুক।[১৭৬] কুরআন শরীফে ইসলামকে দ্বীনি হানীফ বলা হয়েছে।[১৭৭] এই দ্বীনে হানীফকে দ্বীন ইব্রাহীম বলা হয়েছে।[১৭৮] আর সেই

[১৭৫]. আল-মুনজিদ, করাচী, পৃষ্ঠা : ২৪৩
[১৭৬]. লুগাতে কিশওয়ারী, লাখনো, পৃষ্ঠা : ১৬০
[১৭৭]. আল-কুরআন, সূরা রুম, আয়াত : ৩০
[১৭৮]. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ১৩৫

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হিসেবে ইব্রাহীমিয় হানীফ[১৭৯] এবং মুসলিম হানীফ[১৮০] বলা হয়েছে। আর যারা এই সোজা রাস্তার উপর চলবে তাদেরকে হুনাফা বলা হয়েছে।[১৮১] নোমান বিন সাবেতের উপাধি আবূ হানীফা হওয়া অতঃপর এই উপাধিটি প্রসিদ্ধ হওয়া এবং তাঁর অনুসারীদের হানীফি বলে ডাকা এইসব কিছু ঘটনাচক্রে নয়; বরং এই সূক্ষ্ম ইংগীত যে, ইমাম আবূ হানীফার পন্থা হলো সেই পন্থা যেটি হযরত ইব্রাহীমের পন্থা ছিল। যা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পন্থা এবং যা ঈসা আলাইহিস৷ সালামের পন্থা হবে। যার জন্য কুরআনে হাকীমে ইঙ্গিত করা হয়েছে।[১৮২] আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাখ্যা করে সেই রহস্য থেকে পর্দা উঠিয়েছেন।[১৮৩]

ইমাম আাবূ হানীফা সাধারণ মুসলমানদের ফিকাহ দিয়ে হাদীসের উপর চিন্তা-ভাবনা এবং মাসয়ালাসমূহ আবিষ্কার করার পরিশ্রম থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন।[১৮৪] এটা তাঁর কত বড় অবদান একটু চিন্তা করা উচিত।

মুসলিম বিশ্বে হানাফী মাযহাবের জনপ্রিয়তা

সৎকাজ প্রচার হলে সেখানে আল্লাহর তৌফিক ও গায়েবী সাহায্য থাকে। আর অসৎকাজ প্রচার হলে সেখানে শয়তানের ভূমিকা থাকে। মুসলমানরা ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের কথাকে শুধু এই জন্য গ্রহণ করেছেন, যেহেতু তাঁরা আমাদের তুলনায় মহানবীর অনেক বেশী নিকটবর্তী তাঁরা সাহাবা এবং তাবেয়ীনদেরকে দেখেছেন। এইং জন্য তাঁরা অনেক পরে আসা অন্যান্য ওলামার চেয়ে বোধ শক্তি বেশী ছিল। নিকটবর্তীর স্বচক্ষে দেখা দূরবর্তীর তুলনায় সবসময় বেশী হয়। সে জন্য মুসলমানরা বছরের পর বছর তাঁদের উপর আস্থাশীল ছিলেন।

ইমাম আাবূ হানীফা কুরআন-হাদীসের নির্ঝাস ফিকাহ আকারে পেশ করেছেন। যারা নজীরবিহীন পুণ্যের কাজ সারাবিশ্বে তা সমাদৃত হয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহর সাহায্যে তাঁর সঙ্গী হয়েছিল।

[১৭৯]. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৬৭
[১৮০]. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৯৫
[১৮১]. আল-কুরআন, সূরা বাইয়িনাহ, আয়াত : ৫
[১৮২]. আল-কুরআন, সূরা জুমা
[১৮৩]. বুখারী শরীফ, ২/৯৭৩, হাদিস : ৮৮৯ (উর্দূ অনুবাদ লাহোর, ১৯৯১)
[১৮৪]. আব্দুল গণি নাবুলুসী : হাদিক্বা, নদিয়া, ১/৮২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

খলিফা হারুন রশিদ (২১৮ হি./৮৩৩ ইং) ইমাম আবূ হানীফার ছাত্র আবূ ইউসুফকে প্রধান বিচারপতির আসনে অধিষ্ঠিত করেন, তখন ফিকাহর হানফীর ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন হয়। আজ থেকে ৬০০ বছর পূর্বে ইবনে খালদুন লেখেছেন যে, হানীফিরা ইরাক, হিন্দুস্তান, চীন, মাওরাউন্নাহার এবং অনায়ব বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে।[১৮৫]

৭-৮ শত বছর পূর্বে অবিভক্ত হিন্দুস্তানের জন্য আমীর খসরু নিজের একটি কবিতায় এই মতামত পেশ করেছেন।

ملک ہند کے کیا کہنے یہاں تو دریا سے مچھلی بھی سنّی ہی نکلتی ہے۔

'হিন্দুস্তান সম্পর্কে কি আর বলা হবে, এখানে তো দরিয়ার মাছ পর্যন্ত সুন্নী হয়ে বের হয়।'[১৮৬]

আর ৪০০ শত বছর পূর্বে একজন মহাসংস্কারক শেখ আহমদ সরহিন্দি মুজাদ্দেদে আলফেসানী লিখেছেন, হিন্দুস্তানের সকল বসবাসকারী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সত্য আক্বিদা পোষণকারী। এখানে বে'দাতী এবং পথভ্রষ্টদের নাম গন্ধও নেই। সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতিটি হলো হানাফী।[১৮৭]

আর প্রায় ৩৫০ বছর পূর্বে আওরাঙ্গজেব আলমগীর (১১১৮ হি./১৭০৭ ইং) ফিকাহ হানিফীকে ইসলামী আইন প্রণয়নের জন্য উপযুক্ত পেয়েছেন। এবং তাকে বুনিয়াদ বানিয়েছেন।

সুবহী মাহমসানী ফতোওয়ায়ে আলমগীরী সম্পর্কে লিখেছেন, এই কিতাবটি সব সময় হানাফী ফিকার বিখ্যাত উৎস। ফতোয়ার এই সংকলনটি আদা সরকারী হিসেবে পরিগণিত।[১৮৮]

ইনসাইক্লোপিডিয়া অফ ইসলামের প্রবন্ধকার লিখেছেন, হানাফী মাযহাব সাবেক উসমানী রাজ্যসমূহ, তিউনিস, মিশর, মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান, তুর্কিস্তান, বোখারা, সমরকন্দ এবং হিন্দুস্তানে এবং পাকিস্তান বাংলাদেশে ছড়িয়ে আছে।[১৮৯]

[১৮৫]. মুকাদ্দমা ইবনে খালদুন, পৃষ্ঠা : ৪৬৯
[১৮৬]. আমীর খসরু
[১৮৭]. শেখ আহমদ সরহিন্দি : রদ্দে রওয়াফেজ, লাহোর ১৯৯২, পৃষ্ঠা : ৯
[১৮৮]. সুবহী মাহমসানী : ফালসাফায়ে শরীয়তে ইসলাম, পৃষ্ঠা : ৮৮
[১৮৯]. ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম, পৃষ্ঠা : ১৩১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইসলামি ইনসাইক্লোপিডিয়ায় লেখা আছে তুর্কি খেলাফত ৬০০ বছর পর্যন্ত এশিয়া মহাদেশ এবং আফ্রিকা ইউরোপে এক বিশাল রাজত্ব কায়েম করে ছিল। দীর্ঘ এই সময়কালে হানাফী মাযহাব মতে সেখানে যাবতীয় কাজ হত।[১৯০]

আর আলহামদুলিল্লাহ এখনতো পূর্বের অবস্থানে অনেক পরিবর্তন এসে গেছে। হানেফীরা এখন সারা বিশ্বের মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ট এবং "সিওয়াদে আজম"।

উস্তাদ আবূ জুহুরা লেখেন, হানাফী মাজহাব কুফা থেকে শুরু হয়। বাগদাদের ওলামারা সেটা চর্চা করেন। মিশর, সিরিয়া, ইরান, ইরাক, মাওয়ারাউন্নাহার পর্যন্ত তা বিস্তৃতি লাভ করে। অতঃপর আরব দেশসমূহের গণ্ডি পেরিয়ে হিন্দো-চীন পর্যন্ত তা পৌঁছে যায়। আফ্রিকা এবং মিশরে শাফেয়ী মাযহাব ছিল অথবা মালেকী মাযহাব। আরমেনিয়া, আজরবাইজন, তিব্রিজ, রাই এবং আহওয়াজে হানাফী মাযহাব অগ্রগামী। পারস্যে হানাফীদের বহুত্ব ছিল। পরবর্তীতে শিয়া ইসনা আশরিয়াদের প্রাধান্য হয়। পাক ভারতে সংখ্যা গরিষ্ট হলো হানাফীরা, শাফেয়ীদের সংখ্যা ১ মিলিয়নের চেয়ে বেশী নয়।[১৯১]

শেখ আহমদ সরহিন্দি মুজাদ্দেদে আল্‌ফেসানী (১০৩৪ হি./১৬২৪ ইং) সত্য বলেছেন, নির্ধিধায় এবং সংকীর্ণতা ছাড়া বলা যেতে পারে যে, হানাফী মাযহাবের নূর মহা সমুদ্রের মত কাশফের মধ্যে দেখা যায় এবং অন্যান্য মাযহাবগুলোকে কুপ ও নদীর মত নজরে আসে। আর বাহ্যিকভাবেও লক্ষ্য করা গেলেও আহলে ইসলামের (সাওয়াদে আযম) সংখ্যাগরিষ্টতা হলো ইমাম আবূ হানিফার সাথে।[১৯২]

প্রফেসর মুহাম্মদ আবূ যুহরা যিনি ল' কলেজ ফুয়াদ ইউনিভার্সিটি কায়রোর গবেষক, তিনি বলেন, এই মাযহাবটি পূর্ব ও পশ্চিম পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। তার অনুসারীদের সংখ্যা বিপুল। যদি হানাফী ফিকাহর মধ্যে মাসয়ালা তখরিজ করার দরজা উম্মুক্ত করে দেওয়া হয়, তাহলে এখনো ওলামারা তার মূলনীতিগুলোর আলোকে এমন সব বিধান তৈরী করবে পারবেন, যা ভূপৃষ্টে বসবাসকারী প্রত্যেক বনী আদমের জন্য সমানভাবে উপযোগী হতে পারে।[১৯৩]

[১৯০]. দায়েরা মা'রিফে ইসলামিয়া, পৃষ্ঠা : ৭৮৬
[১৯১]. আবু যুহরা মিশরী : হায়াতে হযরত ইমাম আবু হানিফা (উর্দূ অনুবাদ) লাহোর ১৯৮০, পৃষ্ঠা : ৬৯৫
[১৯২]. শেখ আহমদ সরহিন্দি : মাকতুবাত শরীফ, খন্ড : ২, মাকতুব নং : ৫৫
[১৯৩]. আবু যুহরা মিশরী : হায়াতে হযরত ইমাম আবু হানিফা (উর্দূ অনুবাদ) লাহোর ১৯৮০, পৃষ্ঠা : ৭০১-৭০২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এটি এমন এক বিজ্ঞ ফকিহ'র বাক্য, যিনি ইমাম মালেক, আহমদ বিন হাম্বল, ইমাম শাফেয়ী এবং ইবনে তাইমিয়ার উপর গবেষণামূলক কিতাব লিখেছেন।

ড. সুবহি মাহমাসানি আধুনিক যুগে হানাফী মাযহাবের আন্তর্জাতিকতার উপরে আলোকপাত করে লেখেন, যে সব দেশ উছমানি সম্রাজ্যের শাসনাধিন ছিল যেমন- মিশর, সিরিয়া, লেবনান তার মাযহাবে এবং বিচার ও আদালত বিভাগে হানাফী মাযহাব মতে চলে আসছে। তিউনিশ সরকারের মাজহাবও এটি তুরস্ক এবং তার অধীন দেশসমূহ। যেমন- সিরিয়া এবং আলবেনিয়ার জনগোষ্ঠির মাযহাবও এটি। বালকান এবং ককেশাসের মুসলমানরাও ইবাদতের মধ্যে এই মাজহাবের অনুসারী। অনুরূপভাবে আফগানিস্তান, তুর্কিস্তান, পাক ভারত বাংলাদেশ এবং চীনেও এই মাযহাবটি অগ্রগামী। এই মাযহাবের অনুসারীরা বিশ্বের মুসলমান জনগোষ্ঠির দুই তৃতীয়াংশ।[১৯৪]

আমির শকিব আরসালান নিজ গ্রন্থ 'হুসনুল মাসায়ি' গ্রন্থের টীকায় লিখেছেন, মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ট হলো ইমাম আবূ হানিফার অনুসারী। স্বয়ং গায়রে মুকাল্লাদ ওলামা নবাব সিদ্দিক হাসান খান (১৩০৭ হি./১৮৯০ ইং), মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরি (১৩৬৭ হি./১৯৪৮ ইং), মৌলভী মুহাম্মদ হুসাইন বটালভী গায়রে মুকাল্লাতদেরকে আটার মধ্যে লবণের সাথে তুলনা করেছেন।[১৯৫]

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সাওয়াদে আযমের' অনুকরণের নির্দেশ দিয়েছেন।[১৯৬] তিনি ইরশাদ করেছেন, দল থেকে যে আলাদা হবে তাকে বাগে খেয়ে ফেলবে।[১৯৭] তিনি আরো ইরশাদ করেন, যে দল থেকে বের হয়ে যাবে সে জাহেলিয়তী মৃত্যু বরণ করবে।[১৯৮]

এত সুস্পষ্ট নির্দেশসমূহ সত্ত্বেও 'সাওয়াদে আযমকে' বাদ দিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরো বানানো কুরআন হাদীসের পরিষ্কার বিরোধিতা। যদি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, যে সমস্ত ছোট দলগুলোর অনুসরণ করা হউক তবে নিশ্চয় গায়রে মুকাল্লাদের অনুসরণ ইসলাম মতে হত। কিন্তু এই যুগে গায়রে মুকাল্লিদরা আটার মধ্যে লবণের সমান। কিন্তু না হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[১৯৪]. সুবহী মাহমসানী : ফালসাফায়ে শরীয়তে ইসলাম, পৃষ্ঠা : ৪৮
[১৯৫]. নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান : তরজমানে ওয়াহাবিয়া, পৃষ্ঠা : ১০, সানাউল্লাহ অমৃতসরি : শময়ে তাওহীদ, পৃষ্ঠা : ৪০, মুহাম্মদ হোসাইন বটালী : এশায়াতুস্ সুন্নাহ, পৃষ্ঠা : ৩৭০
[১৯৬]. মিশকাত শরীফ : কিতাবুল ঈমান, باب الإعتصام অধ্যায় : ২, হাদিস : ৩৫
[১৯৭]. প্রাগুক্ত, হাদিস : ৪৫
[১৯৮]. প্রাগুক্ত, باب الإمارة والقضاء হাদিস : ৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন সিওয়াদে আজম অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ট দলের সাথে থাকা। সাওয়াদে আযম হলো, সুন্নি হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী তার অন্তর্ভুক্ত। দাওয়াত দেওয়ার অধিকার একমাত্র সাওয়াদে আযমের। কেননা এটা সিরাতে মুস্তাকীমে উপর রয়েছে। তারা ছাড়া অন্য যারা নিজের দিকে আহ্বান করে মূলত তারা সোজা রাস্তা থেকে মানুষকে সরিয়ে ফেলে। শরীয়তের হুকুম হলো, যে বিষয়ে মতবিরোধ হবে সেখানে আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে রুজু করা।[১৯৯] হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা বলেছেন, আমি তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে গেছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সে মতে আমল করবে পথ ভ্রষ্ট হবে না। তা হলো কিতাবে এলাহী এবং আমার সুন্নাত।[২০০]

কুরআন শরীফও আমাদেরকে তাক্বলীদের নির্দেশ দিয়েছে, হাদীসের মধ্যেও সাওয়াদে আযমের তাক্বলীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর ইতিহাসবিদরা বলেছেন সাওয়াদে আযম কারা? অনুসন্ধানের কোন দরকার নেই। এই সব সুস্পষ্ট বাস্তবতার পর যদি কেউ সাওয়াদে আযম থেকে পৃথক কোন দল গঠন করে, তাহলে হাদীসে তার কি হুকুম হবে তা পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে। সহীহ মুসলিমের একটি হাদীসেও সাওয়াদে আযমের বিকল্প দল তৈরীকারীদের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা বলে দেওয়া হয়েছে যা লক্ষ্যণীয়।

সে হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তারা এমন সব কথা তোমাদের কাছে আনবে যেগুলো তোমরা শুন নাই এবং তোমাদের বাপ-দাদারাও শুনে নাই...। আরো বলা হয়েছে, তার কাছ থেকে দূরে সরে যাও এবং নিজেদের কাছ থেকে তাদেরকে দূরে রাখ। যেন তারা তোমাদেরকে প্রতারিত না করে এবং ফিতনায় পতিত না করে।[২০১]

আল্লাহু আকবর! তিনি তো দয়ালু মেহেরবান। যা কিছু হবে তার আগে নিজের অনুসারীদের পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছেন।

ইতিহাসের আয়নায় গায়রে মুকাল্লিদ

কোন ব্যক্তি বা আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিষুদগার ঐতিহাসিক সততার পরিপন্থি। প্রত্যেক মানুষ আল্লাহর বান্দা এবং আদম আলাইহিস সালামের সন্তান ও মহানবীর উম্মত। এ তিনটি সম্পর্ক সর্বদা খেয়াল রাখা চায়। এই জন্য প্রবন্ধকার এই ব্যাপারে সচেষ্ট যে, জামানার ব্যাপারে আল্লাহ কসম

[১৯৯]. আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত : ৫৯
[২০০]. মিশকাত শরীফ, খন্ড : ১, লাহোর ১৯৮৬ ইং
[২০১]. মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা : ২৮, দিল্লি থেকে প্রকাশিত। মুসলিম শরহে নববী, ১/৭৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

খেয়েছেন সে জামানার ইতিহাস সততা নিরপেক্ষতা ইনসাফ এবং ঈমানদারির সাথে লেখা হবে। যাতে পাঠক ইতিহাসের সঠিক পটভূমির আলোকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং খড়কুটো আলাদা করতে পারে।

এখন আমরা আহলে হাদীস (গায়রে মুকাল্লিদিন) এর ব্যাপারে ইতিহাসের আলোকে কিছু আলোচনা করব।

প্রথম শতাব্দীগুলোতে আহলে হাদীস এবং সাহিবুল হাদীস ঐ সকল তাবেঈ এবং তবয়ে তাবেঈদের বলা হতো, যারা মৌখিকভাবে হাদীস মুখস্ত করতেন এবং হাদীস থেকে মাসয়ালা-মাসায়েল আবিষ্কার করার সামর্থ রাখতেন। পুরো ইসলামের ইতিহাসে আহলে হাদীস নামে কোন ফেরকার অস্তিত্ব নেই, যদি মাসলাক হিসেবে আহলে হাদীস উপাধিটি অর্জন করার অবকাশ হতো, তাহলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ (তোমরা আমার সুন্নাতের অনুসরণ কর) বা বলে عَلَيْكُمْ بِحَدِيْثِيْ (তোমরা আমার হাদীসের অনুসরণ কর) বলতেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস দ্বারা আহলে সুন্নাত ওপাধিটি গ্রহণ করার পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। আহলে হাদীস উপাধিটির পক্ষে নয়। যেমন তা বলা হয়েছে। আগে ইলমে হাদীসের বিশেষজ্ঞদের আহলে হাদীস বলা হত। কিন্তু এখন যাকে তাকে আহলে হাদীস বলা হচ্ছে। শৈল্পিক সাহিত্যিক ও লেখকদেরকে কলম সৈনিক বলা হয়। কতই আশ্চর্যজনক এবং অযৌক্তিক কথা হলো- প্রত্যেক নির্বোধ ব্যক্তি নিজেকে কলম সৈনিক মনে করা?

পাক ভারতে আহলে হাদীস শব্দের একটি রাজনৈতিক ইতিহাস রয়েছে। যা নিতান্তই আশ্চর্য এবং বিস্ময়কর। উপমহাদেশে এই দলকে প্রথমে ওহাবী বলা হতো। যারা আসলে গায়রে মুকাল্লিদ ছিল। যেহেতু তারা ১৮৫৭ ইং পূর্বে ইংরেজদের সাথে ছিল এবং উপমহাদেশে ব্রিটিশ রাজত্ব কায়েম ও আধিপত্য বিস্তারে ইংরেজদের সাহায্য করেছিল। ইংরেজরা ক্ষমতা অর্জনের পর আহলে সুন্নাতের উপর জুলুমের স্ট্রীমরোলার চাপালো, অন্যদিকে এসব লোকদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিলো।

স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৩১৫ হি./১৮৬৮ ইং) এর বক্তব্য থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন, ইংরেজ গভর্মেন্ট হিন্দুস্তানে ঐ দলটির জন্য একটি রহমত যাদেরকে ওহাবী বলা হয়। ইসলামী রাজত্ব মনে করা হয় এমন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সব অঞ্চলেও ওয়াহাবীদের এই রকম ধর্মীয় স্বাধীনতা দুস্কর বরং অসম্ভব। রাজার আমলদারিত্বে ওয়াহাবীদের থাকা কঠিন, আর মক্কা শরীফে যদি কাউকে মিছে মিছে ওয়াহাবী বলে দেওয়া সঙ্গে সঙ্গে তাকে জেলখানায় অথবা থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং ওহাবী যেই ধর্মীয় স্বাধীনতার সাথে ইংরেজ গভের্মেন্টের করুণার ছায়াতলে ছিল সেটা অন্য কোনো জায়গায় দেখা যায়নি। হিন্দুস্তান তাদের জন্য দারুল আমান বা নিরাপদ বাসস্থান।[২০২]

এটি এমন এক ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া, যার ইন্ডিয়ার রাজনীতি; বরং আন্তর্জাতিক রাজনীতির উপর গভীর দৃষ্টিপাত ছিলো। হিন্দুস্তানে এই সব লোকদের নিরাপত্তা মিলতো কিন্তু উসমানী সাম্রাজ্যে নয় (যেটি মুসলমানদের মহা রাজত্ব ছিলো এবং ইউরোপ এবং আফ্রিকা পর্যন্ত যার পরিধি বিস্তৃতি ছিলো)। এটা এই কথাটা প্রমাণ যে, এই সব লোকদের সম্পর্ক ইংরেজদের সাথে ছিল। আহলে সাউদ এর ইতিহাসের উপর যাদের গভীর নজর রয়েছে, তারা জানেন যে এরা ইসলামি সাম্রাজ্যের পতন এবং আহলে সাউদের ক্ষমতা গ্রহণের পিছনে কি ভূমিকা রেখেছে। এটা কোন মিথ্যা অভিযোগ নয়। বরং ঐতিহাসিক বাস্তবতা যে সম্পর্কে আমাদের নিষ্পাপ যুবকরা জ্ঞাত নয় এবং তাদেরকে সেটা বলাও হয়না। কেননা আমাদের ইতিহাসও স্বার্থের শিকারে পরিণত হয়ে আসছে।

স্বয়ং আহলে হাদীস আলেম মাওলানা হোসাইন বাটালভীর (যিনি ইংরেজ শাসনের পর উপমহাদেশে গায়রে মুকাল্লিদদের মুখপত্র ছিলেন)। একটি লেখা থেকে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের বক্তব্যের সত্যতা পাওয়া যায় তিনি বলেন আহলে হাদীস দলটি ব্রিটিশ গভের্মেন্টের হিতাকাঙ্খী ও সমর্থক হওয়া পিছনে একটি বড় এবং পরিষ্কার প্রমাণ হলো- এই সব লোক ব্রিটিশ সরকারের অধীনে থাকাকে ইসলামী রাজত্বের অধীনস্থ থাকার চেয়ে উত্তম মনে করতো।[২০৩]

ব্যাপারটা কি? ইসলামের দাবীদার একটি দল স্বয়ং মুসলমানদের রাজত্বে সেই নিরাপত্তা পাচ্ছেনা যা ইসলামের শত্রুদের রাজত্বে ভোগ করতে পারতেছে। প্রত্যেক জ্ঞানী তার রহস্য পর্যন্ত সহজে পৌছতে পারেন, ব্যাখ্যার দরকার নাই।

---

২০২. মাকালাতে সার সৈয়দ, ৯/২১১-২১২, লাহোর ১৯৭২ ইং
২০৩. এশায়াতুস্ সুন্নাহ, ৮/২৬২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রাণী ভিক্টোরিয়ার জন্ম বার্ষিকীর উৎসবে মৌলভী হোসাইন বাটালভী যে প্রশংসা পত্র পেশ করেছেন সেখানেও এই স্বীকারোক্তি উল্লেখ ছিল। তিনি বলেন, এই দলটির ব্রিটিশ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা এবং স্থিতির কারণে খুবই সন্তুষ্ট এবং তাদের অন্তর থেকে ধন্যবাদের আওয়াজ অধিক জোরেসুরে ধ্বনিত হতে থাকবে।[২০৪]

এই ভদ্রলোক অন্য এক স্থানে লিখেন, যাদেরকে আহলে হাদীস বলা হয়, তারা সব সময় ইংরেজ সরকারের নিমক হালাল এবং হিতৈষী। এবং এটা বার বার প্রমাণিত হয়েছে। সরকারী পত্র আদান-প্রদানে স্বীকার করা হয়েছে।[২০৫]

ইহুদী খৃষ্টানরা মুসলমানদের জিহাদি আবেগে সবসময় ভীত সন্ত্রস্ত। ১৮৫৭ সালের তৎক্ষণাত পর ইংরেজদের স্বার্থে এই জজবাকে শীতল করার প্রয়োজনীয়তা ছিল। সুতরাং মৌলভী মুহাম্মদ হোসাইন ভাটালভী জিহাদের বিরুদ্ধে ১২৯২ হি./১৮৭৬ ইং সালে একটি পুস্তিকা লিখেন, যার নাম ছিল 'আল-ইকতিসাদ ফি মাসায়েলিল জিহাদ'। মাসউদ আলম নদভীর ভাষায় উক্ত পুস্তিকার উপর ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে লেখককে পুরষ্কারে ধন্য করা হয়।[২০৬]

পাঠক! আপনারা বার বার আহলে হাদীস শব্দটি শুনেছেন, যেমনটা পূর্বে বলা হয়েছে। এই দলটিকে আগে ওহাবী বলা হতো। ইংরেজদের সহযোগিতা এবং আক্বীদার মধ্যে সালফে সালেহীনের বিরুধীতার কারণে উপমহাদেশের জনগণ স্বাধীনতা যুদ্ধ ১৮৫৭ ইং পর তাদেরকে ঘৃণা করতে লাগলো। এই জন্য ওয়াহাবী নাম পরিবর্তন করে আহলে হাদীস নাম করণের জন্য আবেদন করা হয়। নিম্নের বাক্যগুলো লক্ষ্য করুন-

"আর এই কারণে এই দলের লোকেরা নিজেদের ব্যাপারে এই ওহাবী শব্দটির ব্যবহারের উপর কঠোর আপত্তিকরণ এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে সরকারের কাছে আবেদন করে যে, যে সরকারীভাবে ওহাবী শব্দটি রহিত করে এবং তার

---

২০৪. এশায়াতুস্ সুন্নাহ, ৯/২০৫
২০৫. এশায়াতুস্ সুন্নাহ, ১১/২৪-২৬
২০৬. হিন্দুস্তান কি পেহলী ইসলামী তাহরীক, পৃষ্ঠা : ২৯, আয়ুব কাদেরী : স্বাধীনতা যুদ্ধ ১৮৫৭, করাচী-১৯৭৬, পৃষ্ঠা : ৬৪-৬৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ব্যবহার নিসিদ্ধ করার আদেশ জারি করে, তাদেরকে যেন আহলে হাদীস নামদ্বারা ভূষিত করা হয়।"[২০৭]

ব্রিটিশ সরকার বরাবর মৌলভী মোহাম্মদ হোসাইন বাটালভির ইংরেজী আবেদনের উর্দূ অনুবাদ যেখানে ব্রিটিশ সরকারের কাছে ওহাবী শব্দের জায়গায় আহলে হাদীস শব্দের মঞ্জুরী দানের জন্য আবেদন করা হয়।

আবেদন, আহলে হাদীস নামের এলাটম্যান এবং ওহাবী শব্দ রহিত করা।

এশায়াতুস্ সুন্নাহ লাহোর অফিস

পক্ষে জনাব আবূ সাঈদ মুহাম্মদ হোসাইন লাহোরী

সম্পাদক : এশায়াতুস্ সুন্নাহ এবং মুখপাত্র হিন্দুস্তান আহলে হাদীস

বরাবরে সচিবালয় ব্রিটিশ গভর্মেন্ট।

আমি আপনার বরাবরে নিম্মোক্ত বক্তব্য পেশ করার জন্য অনুমতি ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ১৮৮৬ ইংরেজীতে আমি নিজের মাসিক. পত্রিকা ইশায়েতুস্সুন্নাহই একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করি। যেখানে বলা হয়েছে যে, ওহাবী শব্দ যা সাধারণত বিদ্রোহী এবং নিমক হারামের অর্থে ব্যবহার করা হয় এবং যে শব্দের ব্যবহার হিন্দুস্তানের মুসলমানদের ঐ দলটির ব্যাপারে ব্যবহার করা হয় যাদেরকে আহলে হাদীস বলা হয়, যারা সব সময় ইংরেজ সরকারের নিমক হালাল ও হিতাকাঙ্খী রয়ে আসছে যা বারংবার প্রমাণিত হয়েছে ও সরকারী চিঠিপত্র যার স্বীকৃতি রয়েছে তাই এই শব্দের ব্যবহারটি অনুচিত।

সুতরাং এই দলের লোকজন নিজেদের বেলায় এই শব্দের ব্যবহারের উপর খুবই আপত্তি করণ এবং পূর্ণ সম্মান ও বিনয়ের সাথে সরকারের নিকট আবেদন করে যে, যেন সরকারীভাবে (হিতাকাঙ্খীতা ও নিমক হালালের প্রেক্ষিতে) এই শব্দটি নিষিদ্ধ করে তার ব্যবহার অবৈধ ঘোষণা হোক এবং তাদেরকে আহলে হাদীস নামে সম্বোধন করা হউক। সেই প্রবন্ধের একটি কপি চিঠির মাধ্যমে আমি (মুহাম্মদ হোসাইন বাটলভী) পাঞ্জাব সরকার বরাবর পেশ করি এবং সেখানে আবেদন করা হয়, যেন সরকার এ প্রবন্ধটির দিকে দৃষ্টি দেয় এবং ভারত সরকারকেও এইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এই দলের ব্যাপারে ওয়াহাবী শব্দের ব্যবহার সরকারী চিঠিপত্রের বন্ধ করা হোক এবং আহলে হাদীস নামে সম্বোধন করা হোক। ঐ দরখাস্তের সমর্থন আদায়ের জন্য এবং বিষয়টি সত্যায়নের জন্য যে উক্ত দরখাস্ত পাঞ্জাব ও হিন্দুস্তানের সকল

[২০৭]. এশায়াতুস্ সুন্নাহ, ১১/৬৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আহলে হাদীস সদস্যদের পক্ষ থেকে (পাঞ্জাব ও হিন্দুস্তানের সকল গায়রে মুকাল্লাদ আলেমগণ এই আবেদনটি পেশ করার ক্ষেত্রে সমানে অংশিদার) এবং এশায়াতস্ সুন্নাহর সম্পাদক তাদের সকলের পক্ষ থেকে মুখপত্র। আমি (মুহাম্মদ হোসাইন বাটালভী) কিছু সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পাঞ্জাব সরকারের বরাবরে পেশ করি। যেখানে হিন্দুস্তানের সকল পদের আহলে হাদীসদের দস্তখত রয়েছে এবং সেখানে ঐ আবেদনের প্রতি জোড়ালো সমর্থন রয়েছে।

অতএব অনেরাবল মেম্বার সার্লেস এচিস্যান বাহাদুর, যিনি সেই সময় পাঞ্জাবের লেফটেন্যন্ট গভের্ণর ছিলেন ভারত সরকারকে এই আবেদনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে উক্ত আবেদনকে হিন্দুস্তান সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে মঞ্জুর করেন এবং ওহাবী শব্দের ব্যবহার বিরোধিতা ও আহলে হাদীস নাম চালু করার জন্য পাঞ্জাবে নির্দেশ প্রদান করা হউক।

আপনার ঐ একান্ত বিশ্বস্ত

আবূ সাঈদ মুহাম্মদ হোসাইন

সম্পাদক এশায়াতুস্ সুন্নাহ

(এশায়াতুস্ সুন্নাহ পৃষ্ঠা : ২৪-২৫, সংখ্যা : ২, খন্ড : ১১)

এই আবেদন পাঞ্জাব গভর্ণর স্যার চার্লস এচিস্যানকে দেওয়া হয় এবং তিনি তার সমর্থনে নোট লেখে গভর্ম্যান্ট অফ ইন্ডিয়া বরাবর তা প্রেরণ করেন। এবং সেখান থেকে পরে তা অনুমোদন লাভ করেন। ১৮৮৮ ইংরেজীতে মাদ্রাজ, বাঙাল, ইউপি, সিপি ও বোম্বাই সরকারগুলো মৌলভী মুহাম্মদ হোসাইনকে অনুমোদনের কথাটি জানিয়ে দেন।

স্যার সৈয়দ আহমদ খানও বিষয়টি উল্লেখ করে লিখেছেন, মৌলভী মুহাম্মদ হোসাইন সরকারকে আবেদন করে যে, এই ফিরকাটি যারা প্রকৃতপক্ষে আহলে হাদীস, সরকার যেন তাদেরকে ওয়াহাবী নামে সম্বোধন না করে। মৌলভী মুহাম্মদ হোসাইনের প্রচেষ্টায় সরকার তা অনুমোদন করে। যেন আগামীতে সরকার লেখা-লেখিতে এই দলটিকে ওহাবী শব্দের স্থলে আহলে হাদীস নামে উল্লেখ করবে।[২০৮]

এখন ইতিহাসের আলোকে আহলে হাদীস নামক দলটির (যারা আসলে গায়রে মুকাল্লাদ) আসল বিষয়টি জানতে পেরেছেন। এইগুরূপটি আহলে সুন্নাতের চরম বিরোধী এবং ইজতেহাদের দাবিদার।

[২০৮]. মাকালাতে স্যার সৈয়দ, ৯/২১০-২১১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ফিলিস্তিনের বিখ্যাত আলেম এবং জামেয়া আযহার মিশরের উস্তাদ আল্লামা ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানি (১৩৫০ হি./১৯৩২ ইং) যিনি নাবলুসের বিচারপতি এবং আদালত বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন তিনি বলেন, তারা ইজতেহাদের দাবিদার। কিন্তু দুনিয়াতে ধারাবাহিক যে অরাজকতা চলছে, আহলে সুন্নাতের মাযহাবসমূহের মধ্যে কোনো মাজহাবকে তারা মানে না। শয়তান তাদের মধ্যে থেকে নতুন নতুন দল সৃষ্টি করে যারা ইসলাম পন্থিদের সাথে লড়াই করে।[২০৯]

উপরের এই বাক্যগুলোর মধ্যে আদালত বিভাগের এই মন্ত্রী এবং বিচারপতি তিনটি কথা বলেছেন,

১. আহলে সুন্নাতের মাযহাব অর্থাৎ- হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বলী। এই সব আহলে সুন্নাত জামাতের কোনোটিই তারা নয়।

২. শয়তান তাদের মধ্যে থেকে নতুন নতুন জামাত সৃষ্টি করে তুলছে। এই কথাটি যদিও খুবই তিক্ত কিন্তু তবুও বাস্তব। আহলে হাদীস আলেম মৌলভী মুহাম্মদ হোসাইন বিস্ময়কর তথ্য দিয়েছে।

আশ্চর্য কথা হলো, হাদীস অস্বীকারের যে ফিৎনা শুরু হয় তাও আহলে হাদীসের মসজিদ থেকে শুরু হয়। যেটি উক্ত মতবাদ প্রতিষ্ঠার হেড কোয়াটারে পরিণত হয়।[২১০]

বর্তমানে কিছু দল এই চিন্তাধারা ব্যাপক প্রচার করে চলছে। ইতিহাসের আলোকে আপনি পড়েছেন এই দলের সম্পর্ক ইসলামের শত্রু ইংরেজদের সাথে। আহলে কুরআন নামধারী দলটি যেহেতু তাদের মধ্যে থেকে বের হয়েছে তারাও এই গাছের শাখা স্বরূপ।

৩. তৃতীয় কথা তিনি যেটা বলেছেন ইসলামপন্থীদের সাথে তাদের লড়াই ব্যাপারটি তার সত্যতা বালাকোট আন্দোলনে ১৮৩০ ইং[২১১]/১৮৫৭ ইং ইংরেজদের সাহায্য করা এবং ইংরেজদের সহায়তায় আহলে সউদের সরকার প্রতিষ্ঠা এবং মুসলমানদের নির্দ্বিধায় রক্তপাত থেকে তা বুঝা যায়।[২১২] (ইতিহাসের এই রক্তাক্ত অধ্যায়টি গোপন রয়ে গেছে আমাদের যুবকরা যে

[২০৯]. শওয়াহিদুল হক, লাহোর- ১৯৮৮, পৃষ্ঠা : ৪৯
[২১০]. এশায়াতুস্ সুন্নাহ, লাহোর, ১৯/২৫২
[২১১]. ওয়াহিদ মাসউদ আহমদ : সৈয়দ আহমদ শহীদ কি সহীহ তাসভীর, লাহোর- ১৯৬৭, যাইদ আবুল হাসান ফারুকী : মাওলানা ইসমাঈল দেহলভী আওর তাকবিয়াতুল ঈমান, দিল্লি- ১৯৮৪ ইং
[২১২]. হুসাইন আহমদ মাদানী : নকশে হায়াত, করাচী- ১৯৭৯, ২/৪১৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ব্যাপারে বেখবর) বর্তমানে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আহলে সুন্নাতের বিরুদ্ধে লড়ায়ে ব্যস্ত রয়েছে এই দলটি। এই জন্য আদালত বিভাগের মন্ত্রী যা বলেছেন, সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফে শয়তানি ফিৎনাগুলো সম্পর্কে শতর্ক করেছেন-

> "হে আদম সন্তান সাবধান! শয়তান যেন তোমাদেরকে ফিৎনায় পতিত না করে। যিনি তোমাদের মাতা-পিতাকে বেহেশত থেকে বের করে দিয়েছে। নিশ্চয় শয়তান ঐ সব লোকের বন্ধু যারা ঈমান আনে না।"[২১৩]

এই সমস্ত আলোচনার উদ্দেশ্য হলো আহলে হাদীসের কথা শোনা এবং তাদের সমর্থক হওয়ার পূর্বে তাদের সূচনা অতীত কর্ম এবং বর্তমান কর্মসূচী এবং তার ফলাফলকে অবশ্যই সংগ্রহে রাখতে হবে। স্বয়ং আহলে হাদীসের যুবকরা যারা এই সব তিক্ত বাস্তবতা সম্পর্কে প্রথম বারের মত জানতে পেরেছেন তারা যেন নিজেদের চিন্তা ও কাজের ব্যাপারে গম্ভীর্যের সাথে চিন্তা করে। আহলে হাদীস আলেম নবাব ওয়াহিদুজ্জামান খান এই দলের কর্মপন্থার সমালোচনা করেছেন যা স্বয়ং আহলে হাদীসের জন্য ভাবার বিষয়। তিনি বলেন, আমাদের আহলে হাদীস ভাইয়েরা ইবনে তাইমিয়া এবং ইবনে কাইয়িম ও শওকানী (১৪৫০ হি./১৮৩৪ ইং) এবং শাহ ওয়ালি উল্লাহ ও ইসমাইল শহিদ (১২৪৭ হি./১৮৩১ ইং) কে ধর্মের ঠিকাদার বানিয়ে ফেলছে। যেখানেই কোনো মুসলমান এই সব বুযর্গদের বিপরীত মতামত গ্রহণ করেছেন, সাথে সাথে তাদের পিছু নেওয়া হয়েছে। তাদেরকে ভাল-মন্দ বলা হয়েছে। ভাইয়েরা কিছুটা চিন্তা কর এবং ইনসাফ করো। যখন তোমরা আবূ হানীফা, শাফেয়ীর তাক্বীলদ ছেড়ে দিয়েছ তাহলে ইবনে তাইমিয়া এবং শাওকানি যারা আরো অনেক পরের তাদের তাক্বলীদ কেন দরকার হবে।[২১৪]

উক্ত বক্তব্য থেকে দুইটি কথা জানা যায়। ১. গায়রে মুকাল্লিদদেরও তাক্বলীদ ব্যতীত কোনো উপায় নেই। ২. যখন উদ্দেশ্যটাই হবে মত বিরোধ ও অরাজকতা, তখন কোনো যুক্তিসংঙ্গত কথা মেনে নেওয়া হয় না। অথচ তা মেনে নিলে মতবিরোধ ও ফাসাদ শেষ হয়ে যায়।

মোটকথা এই সকল বাস্তবতা অধ্যয়নের পর আমাদের যুবকরা নিজের অন্তর থেকে এটা অবশ্যই জিজ্ঞেস করবেন যে, হকপন্থী কারা যারা ইহুদী,

[২১৩]. আল-কুরআন, সূরা আরাফ, আয়াত : ২৭
[২১৪]. মুহাম্মদ আবদুল হালিম চিশতী : হায়াতে ওয়াহিদুজ্জামান, করাচী, পৃষ্ঠা : ১০২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

খ্রিষ্টান এবং কাফের ও মুশরিকদের পক্ষ দিয়েছেন তারা, নাকি যারা তাদের পক্ষ অবলম্বন করেননি এবং নিজের মহান আদর্শ ও কৃতিত্ব দ্বারা ইহুদী, খ্রিষ্টান এবং কাফের মুশরেকদেরকে ইসলামের পথে নিয়ে এসেছেন....? অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ইসলামের শত্রুরা স্বয়ং আমাদের হাতে আমাদের ইতিহাসকে এমনভাবে ময়লাক্ত করে দিয়েছেন যা সরাতে গেলে বছরের পর বছর চলে যাবে। উপরোন্ত যে সব বাস্তব তথ্য জানা যায় তাদ্বারা বুদ্ধি হতভম্ব হয়ে পড়ে। নিজের বুদ্ধি ও চেতনার উপর মাতম করতে ইচ্ছে করে।

মিশকাত শরীফে এই হাদীস রয়েছে, প্রথম উম্মতদের ব্যাধি হিংসা ও বিদ্বেষ তোমাদের মধ্যে ঢুকে পড়বে। এটি ছেচে ফেলা রোগ আমি বলছি না চুলকে ছেচে ফেলে; বরং তা ঈমানকে পরিস্কারভাবে নিয়ে চলে যায়।[২১৫] হিংসা ও বিদ্বেষ এমন দুটি রূপ যা মানুষের মধ্যে প্রাকৃতিকভাবে রয়ে গেছে।

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا ﴿٨﴾

"অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম এবং সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন।"[২১৬]

চক্রান্ত ঐ সকল ঘুমন্ত খারাপ চরিত্রগুলোকে নানা কৌশলে উসকিয়ে দেয়। তারপর যার বিরুদ্ধে মন চায় ব্যবহার করে। ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে উসকে দেওয়া হয়। যেন ইসলামের সবুজ শ্যামলা ভূমি সাফ হয়ে যায় এবং সেখানে দ্বিতীয়বার উৎপাদন না হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বড় মনস্তাত্তিক বাস্তবতা তথ্য দিয়ে গেছেন।

তাক্বলীদ থেকে পলায়ন করার প্রবণতা দাসত্ব যুগের স্মৃতিস্বরূপ। যখন ইসলামের শত্রুরা মুসলিম বিশ্বে পা জমিয়েছে, তখন অবিভক্ত ভারতেও ইংরেজদের হিতৈষী একটি দল তৈরী হয়েছে যাদেরকে ওয়াহাবী বলা হয়। এই দলের নেতারা ইংরেজ শাসকগুলোকে আবেদন করে যেন ওয়াহাবীর স্থলে আহলে হাদীস বলা হয়। তারা দরখাস্তটি অনুমোদন করে। যেহেতু এই জামাতের শীর্ষ ব্যক্তিরা ইংরেজীদের সাহায্য করেছিল, তার পুরস্কার স্বরূপ ইংরেজ শাসকরা এই দলের নাম আহলে হাদীস রেখে দিল।[২১৭] এই নামটি

[২১৫]. যাইদ আবুল হাসান ফারুকী : সওয়ানেখে বেবাহায়ে ইমামে আযম আবু হানিফা, লাহোর- ১৯৯১, পৃষ্ঠা : ২২৯
[২১৬]. আল-কুরআন, সূরা সামশ, আয়াত : ৮
[২১৭]. ভারত সরকারের প্রতি বিট্রিশ সরকারের চিঠি (২ জুলাই ১৮৮৮) নং : ৩৮৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কুরআনে নেই, হাদীসে নেই, খাইরুল কুরুনেও দেখা যায় না এবং ইতিহাসের আর কোথাও পাওয়া যায় না। এই জন্য চিন্তাবিদরা এই নামকে বেদআত মনে করে। তাও বেদাআতে সাইয়াহ (মন্দ বেদআত)। কেননা তা দ্বারা মুসলিম মিল্লাতের ঐক্যে ফাটল পড়েছে এবং তারা একটি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আফসোস আমরা মনোবৃত্তিকে নিজেদের গুরু বানিয়েছি এবং সেই পথে চলে পড়েছি। যে পথে মন আমাদেরকে পথপ্রদর্শন করে। কুরআনে পরিষ্কার বলা হয়েছে,

"অনেকে রয়েছেন নিজেদের মনোবৃত্তি দ্বারা নিজেদের অজান্তে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। নিশ্চয় তোমার রব সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালো করে জানেন।"[২১৮]

কুরআন শরীফ বারংবার মনে যা চাই সেই মতে না চলার উপর নির্দেশ করেছে। অন্য স্থানে আল্লাহ বলেন,

"তার কথা শুনিওনা যার অন্তরকে আমরা আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি। সে নিজের প্রবৃত্তির পিছে চলেছে এবং সে সীমালঙ্ঘন করেছে।"[২১৯]

আরো ইরশাদ হচ্ছে-

"তুমি প্রবৃত্তির পিছে যেওনা কেননা, হক থেকে আলাদা হয়ে যাবে।"[২২০]

অন্য জায়গায় আল্লাহ বলেন, আপনি বলে দিন, হে কিতাবিরা! নিজের ধর্মে অন্যায় বাড়াবাড়ি করিওনা এবং এমন লোকের প্রবৃত্তির উপর চলিওনা, যারা আগে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সোজা রাস্তা থেকে ফসকে পড়েছে।"[২২১]

বিভিন্ন আয়াতসমূহে মনোবৃত্তির উপর চলন্তকদের আলোচনা করা হয়েছে। এবং সে মতে চলাকে বারণ করা হয়েছে।[২২২] আমরা মনোবৃত্তির উপর চলাকে হাদীস মতে চলা মনে করেছি এবং আহলে হাদীস নামে খ্যাতি অর্জন করেছি!!

আমাদের অবস্থা বড় আশ্চর্যজনক যখন সাহাবা, তাবেয়ী, তবেতাবেয়ী এবং আইম্মায়ে মুজতাহেদীনের তাক্বলীদের কথা আসে তখন আমাদের সমালোচনার চেতনা জাগ্রত হয়ে উঠে। এবং যখন কাফের, মুশরিক, ইহুদী,

[২১৮]. আল-কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত : ১১৯
[২১৯]. আল-কুরআন, সূরা কাহাফ, আয়াত : ২৮
[২২০]. আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত : ১৩৫
[২২১]. আল-কুরআন, সূরা মায়েদাহ, আয়াত : ৭৭
[২২২]. আল-কুরআন, সূরা মুহাম্মদ, আয়াত : ১৪-১৬, সূরা আযাত : ৫৬, সূরা মায়েদাহ, আয়াত : ৪৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নসরা এবং নাস্তিকদের তাক্বলীদের কথা আসে তখন আমাদের সমালোচনার চেতনা ঘুমিয়ে পড়ে। বিবেক জিজ্ঞেস করে এই চেতনা ইসলামী, না অনৈসলামি। আমাদের অনুভূতির রং-ঢং এবং গন্ধ অমুসলিমদের ন্যায়। আমরা ইহুদী, খ্রিষ্টান এবং কাফের, মুশরেকদের আইন মেনে চলা এবং নিজের দেশে তা চালু করার জন্য তৈরী। কিন্তু যখন ইমাম আবূ হানীফা সম্পাদিত শরিয়া আইনের কথা আসে তখন সমালোচনা শুরু হয়। আমরা আল্লাহর প্রেমিকদের তৈরী করা আইনের উপরে আপত্তি প্রদান করি। কিন্তু আল্লাহর অভিশপ্তদের আইনের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ নেই। কি অবস্থা হবে আমাদের খুবই চিন্তা করা দরকার।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সর্বোত্তম যুগ আমার। অতঃপর পরবর্তীযুগ। অতঃপর পরবর্তীযুগ।[২২৩]

খায়রুল কুরুনের মুহাদ্দিস এবং ফকিহগণ আনুগত্যের বেশী হকদার? নাকি সাররুল কুরুনের ওলামা ও বুদ্ধিজীবিদের? সঠিক বিবেক তার জবাব চাই? আপনি নিজেই তার জবাব দিন।

আন্তর্জাতিক চক্রান্ত এবং সময়ের দাবি

আমরা চতুর্পার্শ্বে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত দ্বারা ঘেরাও। যার একমাত্র উদ্দেশ্য আমাদের দৃষ্টিতে আমাদেরকে হেউ প্রতিপন্ন করা। যেন বর্তমানে আমরা পশ্চাৎপদ হয়ে পড়ি এবং ভবিষ্যতে মাথা উচুঁ করতে না পারি। আপনি চিন্তা করুন এবং খুবই চিন্তা করুন আর বর্তমান অবস্থার গভীর দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করুন, কখনো কুরআন শরীফের শব্দ এবং অক্ষরকে আল্লাহর কালাম না বলে কুরআনকে সম্মান করা থেকে আমাদেরকে বাধাঁ প্রদান করা হয়। অথচ স্বয়ং কুরআনে বার বার কুরআনকে সম্মান করার কথা এসেছে এবং নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।[২২৪] কখনো কুরআনের উপর জোর দিয়ে তফসীরের বিশাল ভাণ্ডারকে অস্বীকার করা হয়েছে। যেন- মুজতাহেদীন এবং ফিকাহর সমস্ত পুজিঁ মূল্যহীন হয়ে যায়। কখনো মুহাদ্দিসগণের উপর আপত্তি তোলা হয়। যেন সমস্ত মুহাদ্দিস এবং হাদীসের মূল্যবান সম্পদ সংশয়যুক্ত হয়ে পড়ে। কখনো মহানবীর ব্যক্তিত্বের রূপরেখার এবং তার ফযিলতসমূহকে আলোচনায় আনা হয়। মহানবীকে (নাউজুবিল্লাহ) সাধারণ মানুষের কাতারে

২২৩. মিশকাত শরীফ, কিতাবুল মানাকিব, باب مناقب الصحابة অধ্যায় : ১, হাদিস : ৪

২২৪.

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নিয়ে আসা হয়। যেন সীরাত এবং সীরাত সংশ্লিষ্ট পুরো ধনভাণ্ডার দৃষ্টিতে মূল্যহীন হয়ে পড়ে।[২২৫] কখনো না'ত এর উপর আপত্তি করা হয়। যাতে সাহিত্যের এই গুরুত্বপূর্ণ কথন পদ্ধতির পুরো শৈল্পিক পুজিঁ মূল্যহীন হয়ে পড়ে। কখনো আউলিয়াদের উপর অভিযোগ করা হয়। যেন তাঁদের জীবনচরিত এবং লেখাসমূহের মহান পুজিঁ মূল্যহীন হয়ে যায়। কখনো হকপন্থী ওলামাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্তাপন করা হয়। যেন তাঁদের প্রচেষ্টাসমূহ মাটিতে মিশে যায় এবং তাদের বিশাল ব্যক্তিত্ব মানুষের নজরে পতিত হয়ে পড়ে। সমষ্টিক এবং বৈচিত্রময় বিষয়গুলোর উপর তাদের লেখনীর বিশাল পুজিঁ যেন মূল্যহীন হয়ে পড়ে। এই সকল পুজিঁ আরবী এবং ফার্সীতে রয়েছে। আরবী এবং ফার্সী পড়ুয়া ছাত্র বহুকাল ধরে কলেজ এবং স্কুলসমূহে দেখা যায় না। আরবী, ফার্সী আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির চাবি এবং আমাদের জাতীয় অস্তিত্বের দু'চোখ, সেটা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলে চক্ষুদৃষ্টি হারিয়ে ফেলব।

আপনি লক্ষ্য করেছেন, কত সূচিন্তিত প্রক্রিয়ায় আমাদের বুযর্গগণ এবং আমাদের ইলমী সম্পদকে নজর থেকে ফেলে দেওয়ার প্রয়াস চলছে। আমাদের লাইব্রেরীগুলো জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভরা। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে সেগুলোর কোনো দাম নেই।

ড. ইকবাল যখন ইউরোপের লাইব্রেরীগুলোতে আমাদের এ সকল খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গের কিতাবসমূহের একটি বড় ভাণ্ডার দেখেছেন তখন আত্মচেতনাবোধ তাঁকে ব্যাকুল করে দেয় এবং তিনি বলে উঠেন।

مگر وہ علم موتی کتابیں اپنے آباء کی جو دیکھوان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا

কিন্তু ইলমের মুক্তা ঐসকল কিতাব আমাদের পূর্বসূরীদের, ইউরোপে যখন সেগুলো দেখবে তোমার অন্তর ব্যথায় টুকরো হবে।

আমাদের শত্রুরা আমাদেরকে লুটপাট করে নিজেদের প্রসাদকে সাজিয়েছে। আমাদের চিন্তা গবেষণা দ্বারা নিজেদের বাতি আলোকিত করেছে। কিন্তু আমাদের চক্ষু থেকে দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিয়েছে। যে শানদার ইলমী ভাণ্ডার দেখে ইকবালের হৃদয় টুকরো টুকরো সেই বিশাল ভান্ডারের মহত্ব আমাদের অন্তর থেকে বের করে দেয়া হচ্ছে। এই ভান্ডারের লেখকদেরকে কাফের এবং মুশরেক প্রমাণিত করা হচ্ছে। এই সকল চক্রান্তের উদ্দেশ্য একটি, আমাদের অতীত থেকে আলাদা করে দেওয়া। যেন ইসলামের শত্রুরা নিজেদের উদ্দেশ্য

২২৫

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সাধনের জন্য আমাদেরকে ব্যবহার করতে পারে। যে আন্দোলন আমাদেরকে অতীত থেকে আলাদা করে দেয় এবং যে প্রয়াস আমাদের নজরে আমাদের শানদার অতীত এবং আমাদের বুযর্গদেরকে মূল্যহীন করে দেয় সেটা কোনো ইসলামী আন্দোলন হতে পারে না। নিশ্চয় ষড়যন্ত্রই হতে পারে! সঠিক বুদ্ধি এটাই বলে।

বক্ষমান নিবন্ধ শেষ পর্যায়ে ছিল এমন সময় কুয়েতের সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সৈয়দ ইউসুফ হাশেম রেফাঈর নজরদের উলামাদের নামে লেখা একটি ব্যথাভরা পয়গাম নজরে আসে। যেটি আবূ উসমান কাদেরী উর্দু ভাষায় তরজমা করেছেন এবং সুফ্ফা একাডেমী ১৯৯৯ ইং তা প্রচার করে। এই চিঠিতে রেফাঈ সাহেব অনেক এমন কথা লেখেছেন যা দ্বারা ইসলামের শত্রুদের জিঘাংসার অনুমান করা যেতে পারে। যা মুসলিম সরকারগুলোর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। রেফাঈ সাহেব সৌদি আরবে থেকে স্বচুক্ষে দেখেছেন সেগুলো বড়ই মনের ব্যথা নিয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি লেখেন,

তাওহীদপন্থীদের উপর শিরকের অপবাদ দেওয়া, মুসলমানদেরকে কাফের অখ্যায়িত করা, চার ইমামের তাকলীদ থেকে বাধা দেওয়া, বিশেষ মানসিকতার অধিকারী মৌলভীদেরকে জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া, হারামাইন শরীফাইনে মুসলিম বিশ্বের সম্মানি আলেমদেরকে বক্তব্য রাখার অনুমতি না দেওয়া, সরকারী কর্মচারীদের হুজুরে আনওয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র রওজা মুবারকের মুয়াজাহা শরীফের দিকে পিঠ পিরিয়ে বেয়াদবির সাথে দাঁড়ানো, বুযর্গদের কবরগুলোকে শহীদ করা, উসিলা, জিয়ারত এবং মিলাদের প্রবক্তাদেরকে শাস্তি দেওয়া, দরুদ ও সালামের কিতাবগুলো নিষিদ্ধ করা এবং শরীয়ত বিরোধী আড্ডাগুলোর উপর নিষেধাজ্ঞা না থাকা, নিজের মতামত অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া, মসজিদে নববীতে রং করার নামে না'তের কবিতাগুলো মিটিয়ে দেওয়া। যে ব্যক্তি রওজা শরীফ নির্মাণকে বিদআত বলেছে, রাওযা শরীফকে মসজিদে নববী থেকে বের করে দেওয়ার প্রস্তাব করেছে, তাকে সম্মানিত করা, আহলে সুন্নাতের বুযর্গদের কিতাবসমূহে ইলমী হিয়ানত এবং বিকৃত করা, হযরত খদিজার ঘরকে ধ্বংস করে সেখানে বাথরুম বানানো, নবীর জন্মের জায়গায় চতুষ্পদ জন্তু বাধা, ছোট ছোট ছেলে এবং বেকুফদেরকে আহলে সুন্নাতের বুযর্গ এবং চার ইমামের বিরুদ্ধে বলার খোলা অনুমতি প্রদান, মদিনা মনোওয়ারায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে ছাত্রদের মানষিকতাকে বিকৃত করা, তাদেরকে তাদের মা-বাবার বিরুদ্ধে দাঁড় করানো এবং তারা নিজেদের মা-বাবাকে কাফের-মুশরিক মনে করা, ওলীদেরকে কাফের আখ্যা দেওয়া, পূর্ব থেকে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নিয়োগপ্রাপ্ত আরো আহলে সুন্নাত ওলামাদেরকে হেরেম শরীফে নিয়োগ থেকে বিরত রাখা। এমনকি ড. সৈয়দ মুহাম্মদ বিন আলাভী মালেকীর উপর কুফুরের ফতওয়া দিয়ে তাকে হত্যার চক্রান্ত করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

আপনি লক্ষ্য করেছেন এইসব বিষয়গুলোতে মুসলিম মিল্লাতের বুযর্গগণ এবং মুসলিম মিল্লাতের নিদর্শনসমূহের অবমাননার উপাদান রয়েছে। এই পয়গামে এই সমস্ত বাস্তবতা ছাড়াও আরো অনেক কথা রয়েছে, এটি কোনো সংকীর্ণ নির্বোধ, অনারব ব্যক্তির লেখা নয়। এটি একজন গুরুত্বর্পূ সরকারী পদে অধিষ্টিত আরব আলমের লেখা।[২২৬] সে জন্য এটি দৃষ্টি আকর্ষণ যোগ্য। এই লেখা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, চার ইমামের বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক আন্দোলন চলছে যার উদ্দেশ্য ইসলামের শত্রুদের পরিকল্পনাকে পূর্ণ কর। এই আন্দোলনটির সাথে মাযহাবের কোনো সম্পর্ক নেই। এটি ঘরগুলোকে উজাড় করে দিবে, নগরগুলোকে ধবংস করে দিবে। এই কথা মনের আবেগ থেকে বলছি না; বরং ইতিহাসের গভীর অধ্যয়ন এই মত প্রকাশে বাধ্য করেছে। যদি কারো ভালো না লাগে তাহলে নিবন্ধকার দুঃখিত। আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মুসলমানকে সঠিক জ্ঞান এবং ইসলামের শত্রুদের জিঘাংসা টের পাওয়ার অনুধাবন দান করুন। যাতে আমরা সত্য রাস্তার উপর চলতে পারি। আমীন! ছুম্মা আমীন॥

হায়! বিশ্ব পরিস্থিতির উপর আমাদের সেই অন্তরদৃষ্টি তৈরী হতো যা আমাদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিবে। এই সময় আমাদের বড়ই বিচক্ষনতার প্রয়োজন। ঈমানের উপাদানকে ধারণা করা জরুরী। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রংএ রংগিয়ে যাওয়া জরুরী। শতাব্দীর কাল ধরে আমাদের বুজুর্গরা যে সীরাতে মুস্তাকীমের উপর চলে আসছে, সে সীরাতে মুস্তাকীমের উপর চলা জরুরী। প্রত্যেক হাতকে ঝাড়িয়ে ফেলে মহানবীর দামনে গিয়ে লাগা উচিৎ আমাদের সকলের।

এই সময় মুসলিম উম্মাহ মানসিক অস্থিরতার কারণে নানা দলে বিভক্ত। এই বিভক্তি চলমান রয়েছে, এই খন্ড বিখন্ড হওয়ার প্রক্রিয়া শেষ হওয়া চাই। তার সমাধান এটাই যে আমরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ নির্দেশনার মত আমল করব এবং সাওয়াদে আযমের অনুসরণ করব।[২২৭]

আমরা অনুসন্ধান করব যে সাওয়াদে আযম কোথায়? বাস্তবতা থেকে মুখ ফিরালে চলবে না। যা নজরে আসে সেটাই দেখবো এবং অন্যকেও দেখাবো।

---

[২২৬]. এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানতে 'নজদি উলামা ভাইদের প্রতি নসীহত' নামে আল্লামা ইউসুফ রেফাঈর পুস্তকটি আমরা প্রকাশ করেছি। সংগ্রহ করুন।

[২২৭]. মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা : ৩০, সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতান, باب السواد الأعظم পৃষ্ঠা : ৩০৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ব্যক্তিগত ও সামাজিক অহংবোধ শেষ করে সাওয়াদে আযমের রজ্জুকে শক্ত করে ধারণ করব। এটাই হকের উপর থাকার নাম। তার জন্য চিৎকার দিয়ে দিয়ে কুরআন বলছে-

"হে ঈমানদাররা আল্লাহর রশিকে আকড়িয়ে ধরো এবং টুকরো টুকরো হওনা।"[২২৮]

আল্লাহ এটা বলেছেন, এক হয়ে যাও। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাওয়াদে আযমের সাথে থাকো। এক হয়ে পড়ো। অথচ আমরা নিজেদের পৃথক পৃথক টুকরো বানিয়ে আল্লাহর এই ধমকি শোনার জন্য তৈরী হয়ে পড়ি।

এবং অনেকেই নিজের প্রবৃত্তি দ্বারা নিজের অজান্তে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। নিশ্চয় তোমার রব সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালো করে জানেন।[২২৯]

সীমালঙ্ঘনকারী তারাই যারা আল্লাহ এবং রাসূলের হুকুমকে পাশ কাটিয়ে নিজেদের ক্ষুদ্রতম অংশকে আলাদা করে নেয়। আকল এইটাই বলে তাদের দামনে লেগে থাকবো যারা আহলে বাইত সাহাবা, আইম্মায়ে মুজতাহেদীন, মুহাদ্দেসীন, ওলামা, ফুকাহার দামনের সাথে শতাব্দী ধরে সম্পৃক্ত রয়েছেন এবং কখনো সে সীরাতুল মুস্তাকীম থেকে মুখ ফিরাবো না। তা থেকে পশ্চাদ করব না। এই জন্য কুরআনে হাকীমে আল্লাহ বলেন,

"এবং ইব্রাহীমের দ্বীন থেকে কে মুখ ফিরাবে, কেবল সে, যে মনের দিক থেকে বোকা।"[২৩০]

অন্তরকে আহমক বা বোকা বলা হয়েছে, জ্ঞানকে বলা হয় নাই। অর্থাৎ যার জ্ঞানতো খুবই সক্রিয়। কিন্তু অন্তর যেন বন্ধভূমি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে আলোকিত অন্তর দান করুন। এবং আমাদেরকে সকলকে সীরাতে মুস্তাকীমের উপর চালান। আমীন॥

মুহাম্মদ মাসউদ আহমদ
২/১৭সি
১৪২০ হি./১৯৯২ ইং
পি, এ, সি, এইচ, সোসাইটি, করাচি, সিন্ধু, পাকিস্তান।

[২২৮]. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১০৩
[২২৯]. আল-কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত : ১১৯
[২৩০]. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ১৩০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রমাণপঞ্জি

১. আল-কুরআনুল করীম।
২. ইবনে হাজর মক্কী : আল খায়রাতুল হিসান ফি মানাকিবীন নোমান।
৩. ইবনুত তালাহ আল-উন্দোলুসি : আকজিয়াতুল রাসূল (তাহকীক ও হাশিয়া জিয়াউল কুরআন আযমী, মনসূরা, লাহোর।
৪. ইবনে আব্দুল বার কুরতুবী : জামেউ বয়ানিল ইলমী ওয়া ফজলীহি, মিশর।
৫. ইবনে আব্দুল বার কুরতুবী : আল ইন্তেকা ফিল আইয়ীম্মাতিস্ সালাসাহ আল ফুকহা, কায়রো, ১৩৫০ হি./১৯৩১ ইং।
৬. ইবনে কাইয়্যিম : ই'লামূল মুয়াক্কি'ইন, মিশর।
৭. ইবরাহিম সাথভী : আল মুয়াফেকাত, মিশর।
৮. আবূল হাসান যাইদ ফারুকী : সাওয়ানেভে বেবাহায়ে ইমামে আযম আবূ হানিফা, লাহোর, ১৯৯২ ইং।
৯. আবূল হাসান যাইদ ফারুকী : মাওলানা ইসমাইল দেহলভী আওর তাকভিয়াতুল ঈমান, দিল্লি, ১৯৮৪ ইং।
১০. আবূ যুহরা : হায়াতে হযরত ইমাম আবূ হানিফা, (অনুবাদ : গোলাম আহমদ হারিরী) ফায়সালাবাদ, ১৯৮০ ইং।
১১. আবূ দাউদ সুলাইমান বিন আসআস সাজিস্তানী : সুনানে আবূ দাউদ, লাহোর, ১৯৮৫ ইং।
১২. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী : বুখারী শরীফ ১ম খন্ড, লাহোর, ১৯৮৬ ইং।
১৩. আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আস সিদ্দিক আল গামারী, আল হাসানী : ইসলাম আওর আসরী ইজাদাত (উর্দূ অনুবাদ : আহমদ মিঞা বরকাতি), লাহোর, ১৯৮০ ইং।
১৪. আহমদ সারহিন্দি : মাকতুবাকে ইমামে রব্বানী, আমৃতসরি, ১৩৩৩ হি./১৯১৪ ইং।
১৫. আহমদ সারহিন্দি : রদ্দে রাওয়াফেজ, লাহোর, ১৯৯২ ইং।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

১৬. আল-মওফুক মক্কী : মানাকিবুল ইমাম আবূ হানিফা, দক্ষিণ হায়দরাবাদ।
১৭. আইয়ুব কাদেরী : জংগে আজাদী ১৮৫৭ ইং, করাচী, ১৯৭৪ ইং।
১৮. জমিল আহমদ শরকপুরি : তাযকেরায়ে হযরত ইমাম আবূ হানিফা, করাচী, ১৯৮৬ ইং।
১৯. হাফেজ বিন আলী আল খতিব বাগদাদী : তারীখে বাগদাদ, ১৩তম খন্ড, মিশর, ১৯৩১ ইং।
২০. মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী : নকশে হায়াত ২য় খন্ড, করাচী, ১৯৭৯ ইং।
২১. দায়রায়ে মা'রেফে ইসলামীয়া : পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি, লাহোর।
২২. স্যার সৈয়দ আহমদ খান : মাকালাতে স্যার সৈয়দ, নাশআতে সানিয়া।
২৩. শর্টার ইনসাইক্লোপিডিয়া : লিডন ১৯৬১ ইং।
২৪. শমসুদ্দীন আবূ আব্দুল্লাহ যাহাবী : মনাকিবে আবূ হানিফা, মিশর।
২৫. আস্ সাহিফাতুস সহীহা প্রসিদ্ধ সহীফায়ে হুমাম ইবনে মুনাবিবহ (মুরাত্তিব : ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ), মাকবায়ে নাশআতে সানিয়া, মু'যাম শাহী মার্কেট, দক্ষিণ হায়দরাবাদ, ১৯৫৬ ইং।
২৬. আব্দুল কাদের আহমদ আল কুরুশী : আল জাওয়াহিরু মজিয়া ১ম খন্ড, হায়দরাবাদ।
২৭. আলী মুহাম্মদ আল-আমেরী : আল আহকাম ফি উসুলিল আহকাম, মিশর, ১৯১৪ ইং।
২৮. সৈয়দ আলী হুযূরী : কাশফুল মাহজুব, লাহোর।
২৯. গোলাম রাসূল সাঈদী : তাযকেরাতুল মুহাদ্দেসীন, করাচী।
৩০. মুহাম্মদ হালিম চিশতী : হায়াতে ওয়াহিদুজ্জামান, করাচী।
৩১. মুহাম্মদ আলী আস সাবুনী : সাফ্ওয়াতুত তাফাসির ১৮তম খন্ড, বৈরুত।

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com